# 'আমার জানা শ্রীখণ্ড'

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ—সংগ্রাহক
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
নবদ্বীপ বকুলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রকাশিকা—

শ্রীমতী সুলোচনা কবিরাজ
রামসীতা পাড়া
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীনরহরি কবিরাজ
১২, এভিন্যু নর্থ রোড,
কলিকাতা-৩২

২। শ্রীঅনন্ত বিলাস ঠাকুর
৪বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রিত—

শ্রীশ্যামসুন্দর প্রেস
৫৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

# বিষয় সূচী

## "আমার জানা শ্রীখণ্ড" সম্বন্ধে দু-চার কথা

শ্রীখণ্ড বর্ধমান জেলার একটি ঐতিহ্যময় গ্রাম। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ঠাকুর নরহরি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ এবং মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং গৌরাঙ্গপ্রীতির ফলে এই গ্রামখানি বৈষ্ণবজগতে প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ধর্ম, সংস্কৃতশিক্ষা এবং সঙ্গীতচর্চায় শ্রীখণ্ডের দান বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরমপূজ্য গৌরগতপ্রাণ ৺গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় লিখিত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রীখণ্ডের অবদান সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমার অবসর জীবনে উনিশ ও বিশ শতকের শ্রীখণ্ডের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করা প্রয়োজন বোধ করি।

প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশবরেণ্য আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সহিত ত্রিশ ও চল্লিশ শতকে কয়েকবার শ্রীখণ্ডে গমন করেন। তিনি কয়েকটি বাড়ীতে রক্ষিত পুঁথি পরিদর্শন করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ঠাকুর নরহরি গ্রন্থাগার' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন "এ সকল পুঁথি অমূল্য। কতকগুলির মধ্যে বহু গবেষণার বিষয় আছে। ইহা কয়েকজনকে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।"

১৯১০ সালে শ্রীখণ্ডের উনিশ ও বিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সঙ্কলনে আমার কৌতূহলের বিষয় তাঁহাকে জানাইলে তিনি আমাকে ইহা লিখিবার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি ১৫।১২।১০

তারিখে লেখেন "আপনি শ্রীখণ্ড সম্বন্ধে লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া খুশী হইলাম। আপনি যোগ্য ব্যক্তি, আপনার হাতে কাজটি সুসম্পূর্ণ হইবে, এই আশা রাখি।"

তখন আমি শ্রীখণ্ডের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে উৎসুক হই। তথ্য সংগ্রহের জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করি। তাঁহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। এজন্য এই পুস্তকখানির নাম দিলাম 'আমার জানা শ্রীখণ্ড'।

শ্রীখণ্ডের সংস্কৃতি বলিতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা এবং সঙ্গীত চর্চা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বুঝাইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীখণ্ড সংস্কৃতচর্চায় প্রাধান্য লাভ করে। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

দামোদর সেনের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে একদিন সমস্ত ভারত-ভূমি বিমোহিত হইয়াছিল—যথা সঙ্গীতমাধব নাটকে—

"পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

পরবর্ত্তীকালে এখানে বহু কবি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পর ঠাকুর নরহরির সময় হইতেই শ্রীখণ্ড সংকীর্ত্তনচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে।

এখন আমরা ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রীখণ্ডের অবদান বর্ণনা করিব।

# শ্রীখণ্ডের কবি সম্প্রদায়

১। দামোদর সেন।

ভারত-বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ('সঙ্গীত মাধব' নাটক হইতে জানা যায়)।

২। নরহরি ঠাকুর—

গৌরলীলা বিষয়ক পদরচনার অন্যতম অগ্রদূত।

গ্রন্থাবলী—(ক) ভক্তি চন্দ্রিকা পটল। মহাপ্রভুর ভজন-পদ্ধতি আটটি পটলে (অধ্যায়ে) লিখিত। (খ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্র নাম। ৪৭০ গৌরাব্দে কুসুম-সরোবরবাসী শ্রীকৃষ্ণদাসজী এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন' (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)। (গ) শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃতম্।

৩। লোকানন্দ আচার্য্য শর্ম্মা—(দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত)

ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ—এই গ্রন্থে বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ ভজনের সমস্ত অঙ্গগুলি প্রকাশিত হয়।

৪। রঘুনন্দন ঠাকুর—নবদ্বীপ চন্দ্র স্তবরাজ (মালিনী ছন্দে রচিত)।

৫। গিরিধর দাস—(নরহরি ঠাকুরের শিষ্য)

ইনি পরকীয়া রসস্থাপন—সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—নামক গ্রন্থ লেখেন। ইহা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

> যঃ শ্রীখণ্ডাচল ইব ভুবি ব্যাহৃতঃ
> শ্রীল খণ্ডে-স্তুত্রান্তে শ্রীনরহরিরিব
> প্রেমদো যঃ স্বপাল্য। যস্য স্বান্তে
> বিলসতি সদা শ্রীল চৈতন্য চন্দ্রঃ
> সোঽয়ং শ্রীমন্নরহরি হ প্রেমমূর্তির্গতি র্নঃ। ১৩

৬। দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত

৭। দ্বিজ গোপাল

৮। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর—( ঠাকুর নরহরির শিষ্য ) খ্যাতনামা গীতিকার।

(ক) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ( চারিখণ্ডে লিখিত ; শেষ খণ্ডে ঠাকুর নরহরির এবং গ্রন্থকারের নিজ পরিচয় পাওয়া যায় ) (খ) দুর্ল্ভসার, আনন্দ লতিকা, রাগলহরী এবং রাস পঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ (গ) ধামালী—গৌরলীলা ও ব্রজলীলা বিষয়ক পদাবলী (ঘ) জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের অনুবাদ (ঙ) ব্রজমঙ্গল ( নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নরহরি ঠাকুরের মিলনের বিষয় লিখিত আছে )

৯। কবিবল্লভ—ঠাকুর নরহরির শিষ্য।

ইঁহার নিবাস বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরে 'অরোড়া' গ্রাম। ১৫৯৮ খৃঃ ইনি 'রসকদম্ব' রচনা করেন। এই বইখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে।

১০। রঘুনন্দন ঠাকুরের দ্বাদশ প্রধান শাখা—

(ক) নয়নানন্দ কবিরাজ—ইনি 'অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। (খ) নিকেতন দাস (গ) মহানন্দ কবিরাজ, (ঘ) শ্রীমান সেন, (ঙ) বনমালী কবিরাজ (চ) হোরকী ঠাকুরাণী (বনমালীর পত্নী) (ছ) কৃষ্ণদাস ঠাকুর—নিবাস আকাইহাট। (জ) কবিশেখর বা রায়শেখর (পঞ্চদশক-শতক) 'দণ্ডাত্মিকা' নামক গ্রন্থ রচয়িতা, ইনি ব্রজবুলি কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখক। (ঝ) রামচন্দ্র (ঞ) কবিরঞ্জন বৈদ্য। (ট) চিরঞ্জীব সেন—প্রখ্যাত পণ্ডিত দামোদর সেনের জামাতা। (ঠ) সুলোচন।

১১। মদন রায় ঠাকুর (রঘুনন্দনের পৌত্র)—পদকর্তা ও ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

১২। রামচন্দ্র—চিরঞ্জীবের পুত্র ; গৌর ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে বহু পদ রচনা করেন। মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক। কবিত্বের জন্য তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। তিনি 'স্মরণ দর্পণ

ও 'বঙ্গজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৩। গোবিন্দ দাস—শ্রীখণ্ডবাসী মহাকবি দামোদর সেনের দৌহিত্র। রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরলীলা বিষয়ে এঁর লেখা পদগুলি বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু গোবিন্দ দাসকে 'কবিরাজ' পদবী দান করেন। সঙ্গীত মাধব এবং 'কর্ণামৃত' কাব্য ইঁহারই রচনা।

১৪। বলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস এবং বীরচন্দ্র-চরিত গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার রচিত পদাবলী আছে।

১৫। রঘুনন্দনের পৌত্র মদন রায়ের পৌত্রের নাম রতিকান্ত ঠাকুর। তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পদকর্ত্তা ছিলেন।

১৬। মদন রায় ঠাকুরের এক ভ্রাতার নাম বংশীবদন ঠাকুর। বিনোদ ঠাকুর ছিলেন বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র।

১৭। রতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল রায়চৌধুরী (রামগোপাল দাস) বহু সুললিত পদ রচনা করেন। 'রসকল্পবল্লী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ১৪৯৫ শকাব্দে রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি কোরক (অধ্যায়) আছে।

১৮। রামগোপাল দাসের পুত্র, পীতাম্বর দাস ছিলেন—শ্রীখণ্ডের শচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। পিতার ন্যায় তিনিও সুকবি ছিলেন। পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থে সংস্কৃত, বাংলা এবং মৈথিল কবিদের পদাবলী লিখিত আছে।

১৯। গোপাল ঠাকুর—নিবাস শ্রীখণ্ড—'লীলামৃতরসপুর' নামক প্রবন্ধ ইঁহারই লেখা।

২০। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস—১৭৯৩ খৃঃ রঘুনাথ দাস গোস্বামী রচিত বিলাপ কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থের 'বিলাপ বিবৃতিমালা' নামে পদ্যানুবাদ করেন।

২১। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর—রঘুনন্দন বংশীয় দক্ষিণ খণ্ড আগরডিহি

নিবাসী পদকর্ত্তা।

২২। জগদানন্দ ঠাকুর—রঘুনন্দন বংশীয় জোফলাই নিবাসী—সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও প্রখ্যাত পদকর্ত্তা। স্বপ্নে গৌররূপ দর্শন ক'রে ইনি দামিনী দাম এবং গৌর কলেবর নামক প্রখ্যাত পদ দুখানি রচনা করেন। গীত গোবিন্দের অনুবাদ ইঁহারই রচনা।

২৩। নৃসিংহানন্দ ঠাকুর—ইঁহার লিখিত পদাবলী আছে।

২৪। বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর—নিবাস শ্রীখণ্ড—ইনি বহু পদ রচনা করেন।

২৫। প্রখ্যাত পণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী—শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করেন।

২৬। বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন।

২৭। কীর্ত্তনাচার্য্য গৌর গুণানন্দ ঠাকুর—বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং বহু পদ রচনা করেন।

২৮। বসন্ত কুমার সেন, এম, এ—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

২৯। প্রখ্যাত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক—

৩০। পণ্ডিত লোচনানন্দ ঠাকুর—'কলিতে গৌরাঙ্গ ভজন' গ্রন্থ রচনা করেন।

৩১। সচ্চিদানন্দ ঠাকুর—স্বভাব-কবি ছিলেন। ইনি বহু কবিতা রচনা করেন। 'রসের হাটে নাচে বনমালী' নামক পদটি ইঁহার লেখা।

# সঙ্গীত চর্চ্চা

সঙ্গীত চর্চ্চায় শ্রীখণ্ডের অবদান স্মরণীয়। এখানে সংকীর্ত্তন, কেলোয়াতী গান, কবির গান (শিবের গাজন উপলক্ষ্যে) বোলান গান প্রভৃতির চর্চ্চা হইত। এখনও সঙ্কীর্ত্তনের চর্চ্চা এখানে বর্ত্তমান।

খোল ও করতাল সহ যে গান গাওয়া হয় তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। ষোল শতকের প্রথম ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বঙ্গদেশে সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার করেন।

কীর্ত্তন দুই প্রকার—নাম কীর্ত্তন এবং লীলা কীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের পাঁচটি ধারা আছে—মনোহরসাহী, গরাণহাটী, রাণীহাটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডি।

"সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রীখণ্ডের অবদান অমূল্য। মনোহরসাহী লীলাকীর্ত্তনের সৃষ্টি ও পুষ্টি বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড মণ্ডলে।" (কথাবার্ত্তা-মে-১৯৫৪)

নীলাচলে রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য সাতটি সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। 'শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়' ছিল এই সাত সম্প্রদায়ের অন্যতম। তখন হইতেই শ্রীখণ্ডে নাম-কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তনের ধারা অব্যাহত আছে। ইহার পরবর্ত্তী কালেও শ্রীখণ্ডে বহু পণ্ডিত ও কবির সন্ধান পাওয়া যায়; তবে সে সময়ের সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

উনিশ ও বিশ শতকে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সুগায়ক গোপীনাথ কবিরাজ, গৌরাঙ্গ সেন, সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, রাখালানন্দ ঠাকুর, গৌর গুণানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই মহাজনী পদ অনুসরণ করিয়া লীলা কীর্ত্তন রচনা করিতেন এবং নাম কীর্ত্তন ও পালা

কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া জনসাধারণকে আপ্যায়িত করিতেন।

ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, নিয়মসেবা (একমাস), রাসযাত্রা, বড় ভাণ্ডার মহোৎসব, বসন্ত পঞ্চমী ও রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি, মহাপ্রভুর জন্মতিথি ও দোলযাত্রা, প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে সময়োচিত নাম কীর্ত্তন ও লীলা কীর্ত্তনের প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

## শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরমন্ত্র প্রচার সভা

শ্রীখণ্ড গৌরগণ হিতৈষিণী সভার উদ্যোগে

সন ১৩২০ সাল ২৬, ২৭, ২৮শে মাঘ।

"শ্রীখণ্ড গৌরগণ হিতৈষিণী সভার" উদ্যোগে শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরমন্ত্র বিচার সভার অধিবেশন বসে সন ১৩২০ সালের মাঘ মাসে। এখানে দুই দিন বড় আখড়ার নাট মন্দিরে এবং তৃতীয় দিন সোনার গৌরাঙ্গের নাট মন্দিরে অধিবেশন হয়।

এখানে শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী পণ্ডিত মধুসূদন সার্ব্বভৌম, পণ্ডিত দামোদরলাল গোস্বামী, শাস্ত্রী, গৌরমণ্ডলের নবদ্বীপ মহাপ্রভুর সেবাইত প্যারীলাল গোস্বামী, অদ্বৈত বংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী, কলিকাতার পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, ঢাকা আড়িয়াল নিবাসী হরিমোহন গোস্বামী, মায়াপুরের অধ্যক্ষ বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত, গোস্বামী সন্তান ও ভক্তবৃন্দ এই সভায় সমবেত হইয়া তিন দিন আলোচনার পর তৃতীয় দিবসে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হয়।

## "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গঃ"

## "ভূমিকা"

"সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলিযুগে 'সদোপাস্য' একথা শাস্ত্র ও সদাচারসিদ্ধ। ৺জগদানন্দ দাস পণ্ডিত বাবাজীর মতাবলম্বী কোন কোন গোস্বামী সন্তান 'শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানমন্ত্র নাই,' ইত্যাদি স্বকপোলকল্পিত কথার অবতারণা করিয়া সময়ে সময়ে বৈষ্ণবজগত্কে বিড়ম্বিত করতঃ গৌরভক্তগণের মর্ম্মে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আজ-কালও ঐ বিরুদ্ধমতপোষক দুই চারিজন সময়ে সময়ে উৎপাত সংঘটনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জগদানন্দ বাবাজীর পূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও এইরূপ গর্হিত কথা উঠে নাই এবং উঠিবারও কোন হেতু নাই। অন্যূন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত জগদানন্দ বাবাজীর কল্পিত মত-পোষক দুই একজন গোস্বামী সন্তান শ্রীগৌরাঙ্গের-ধ্যান-মন্ত্র-গায়ত্রী ও ব্রতোপবাসাদি অমান্য করায় এবং শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনার স্রোত রোধ করিবার প্রয়াস পাওয়ায় শ্রীব্রজ-মণ্ডলের আচার্য্য সন্তানগণ ও অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌড়মণ্ডলের সম্মতি ও শ্রীগৌরোপাসনা শাস্ত্র সদাচার-সম্মত এই মর্ম্মে ৩০।৪০ খানা ব্যবস্থাপত্র লইয়া বিরুদ্ধবাদী মন্ত্র-নাস্তিকগণের অসার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শ্রীগৌরমন্ত্র অনাদি-কাল-প্রসিদ্ধ—শ্রীগৌরোপাসনা গুরু পরম্পরা প্রচলিত; সুতরাং তাহাদের মুখের কথায় বৈষ্ণবজগৎ যাহাতে প্রতারিত হইয়া অধঃপাতে

যাইতে না পায়, তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামের আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া একটি ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন এবং তাহার মর্ম্ম শ্রীগৌড়মণ্ডলের মুখ্য মুখ্য স্থান সমূহে জ্ঞাপন করান; সেই সময়েই—বিদ্যার বিলাসভূমি সর্ব্ব গৌরবসম্পন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লীর স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনা একান্ত কর্ত্তব্য এবং শ্রীগৌরমন্ত্র শাস্ত্রসম্মত এই মর্ম্মে এক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। ইদানীং প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান মন্ত্রবিরোধী কোন কোন আচার্য্য সন্তান 'গৌরমন্ত্র নাই' এই কথা প্রচার করায় আচার্য্য বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দ মর্ম্মাহত হয়েন; তাই তাঁহাদের পক্ষ হইতে 'শ্রীখণ্ড গৌরগণহিতৈষিণী সভার' সমুদ্যোগে বিরোধীগণের মতের মূলোৎপাটন করিবার জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-জগতকে আর বিড়ম্বিত হইতে না হয় তদভিপ্রায়ে সন ১৩২০ সালের ২৬শে হইতে ২৮শে মাঘ শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরমন্ত্র বিচার সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বাদী নিরাশ করিয়া অনুকূল পক্ষ জয়লাভ করেন। সভার পূর্ব্বে শ্রীখণ্ড গৌরগণহিতৈষিণী সভা প্রায় সমস্ত পাটবাড়ীর স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং অধিবেশনের শেষে—সভাস্থলে সমবেত আচার্য্যসন্তানগণ, বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষর করেন।

# শ্রীশ্রীবড় ডাঙ্গায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন ১৯১২ খৃঃ

রাজর্ষি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বৈষ্ণব সম্মিলনীর এক অধিবেশন হয় শ্রীখণ্ডে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বড়ডাঙ্গার উৎসবের সময়। নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। শ্রীখণ্ড গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড়ডাঙ্গার বনে ঠাকুর নরহরি নির্জনে ভজন করিতেন। "কার্ত্তিকী শ্রীকৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি, যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি।" নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দন এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উদ্যোগে ঠাকুর নরহরির বিরহ-উৎসব প্রথম সম্পন্ন হয়। তদবধি এখনও এই উৎসবে ঠাকুর নরহরির সাধন ভজনের স্থান শ্রীবড়ডাঙ্গা নাম কীর্ত্তন, রসকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কীর্ত্তন এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠে চারদিন মুখরিত হইয়া উঠে। এই উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গোস্বামী সন্তানগণ, অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ, গৌরগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়।

এই উৎসবকালেই শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন বসে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। বড়ডাঙ্গার বিস্তৃত মাঠ মহারাজার বিরাট তাঁবু দিয়া ঘেরা হয়। ঐ তাঁবুর মধ্যে গোস্বামী সন্তানগণ, অভ্যাগত বৈষ্ণব এবং গৌরভক্তবৃন্দ তিনদিন ধরিয়া বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগদান করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন।

# সিদ্ধ জগন্নাথ দাস ও
# সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী

এই পুণ্যভূমি বড়ডাঙ্গায় পরবর্ত্তীকালেও অনেক অভ্যাগত বৈষ্ণব ভজন সাধন করিতেন। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী এবং সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজীর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভজন সাধন করিতেন। তাঁর ভজন-পদ্ধতি ছিল অতি কঠোর। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা কোন সময়েই তিনি কোন গৃহে বাস করেন নাই। উন্মুক্ত স্থানে একটি নিম গাছের তলায় তিনি দিন রাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। প্রত্যহ তিনি তিন লক্ষ্য নাম জপ করিয়া এবং এক গ্রাস প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিতেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় নব্বই বৎসর তখন তাঁহার গৌরমণ্ডল পরিক্রমা করিবার বাসনা হয়। গৌরমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি শ্রীখণ্ডে আসিয়া সেখানে প্রায় এক বৎসর অবস্থান করিয়া শ্রীবড়ডাঙ্গায় ভজন সাধন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তারপর বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়া তৎকালীন একটি নির্জন স্থানে ভজন সাধন করিতে থাকেন। এখানেই ১৩৭ বৎসর বয়সে তিনি অপ্রকট হন। এখানেই তাঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান। এই স্থানই পরে 'ভজন-কুটীর' নামে পরিচিত হয়।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়েরও শ্রীখণ্ডের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। তিনি নরহরি ঠাকুরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নাগরীভাবে বিভোর হইতেন। তিনি বলিতেন 'নদের চাঁদের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা'। ইঁহার স্বহস্তে তুলট কাগজে

লিখিত ৭২ পাতা—'গোরা গোরা গোরা গোরা গোরা গোরা গোরা গোরা' লেখা নামামৃত স্তোত্রের বিষয় শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকায় ১৯৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমি আমার দিদিমা গোপাঙ্গনা ঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীখণ্ডে আসিয়া নাগরী বেশ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

১৯১৩ সালে আমি তিন বন্ধুসহ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসি। সেদিন মহাপ্রভুর বাড়ীর সংলগ্ন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর সমাধি মন্দিরে ধামেশ্বর মহাপ্রভুর প্রসাদ পাই। ঠাকুর বাড়ীগুলি এবং ভজন কুটীর দর্শন করিবার পর রাণীর ঘাটের নিকটে টপ্পরের নীচে অবস্থিত এক প্রাচীন বৈষ্ণব মহারাজকে দর্শন করিতে যাই। তিনি তখন ধ্যানমগ্ন। আমরা তাঁকে প্রণাম করিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন 'আপনাদের গৌর ভাল আছেন? 'গৌরকুণ্ড' ভাল আছেন?' আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা বুঝিলাম আমরা খণ্ডবাসী বুঝিতে পারায় 'নরহরির প্রাণ গৌরের' এবং বড়ডাঙ্গার (পুকুরটিকে 'গৌরকুণ্ড' বলা হইত) এই কথাই তিনি বলিলেন। এই বাবাজী মহারাজই হইলেন সিদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার এবং তাঁর শ্রীমুখ হইতে নরহরির প্রাণ গৌর ও গৌর কুণ্ডের সন্ধান লইবার মত বাণী শুনিবার সৌভাগ্য জীবনে একদিনই হইয়াছিল।

# শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্য সঙ্গীত,
শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব

২। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব
কণিকা প্রসাদ
শ্রীগৌরাঙ্গগীতা
রসরাজ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
শ্রীশ্রীগৌরভক্তি চন্দ্রিকা

কাশিমবাজারাধিপতি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনের পথপ্রদর্শক মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় কাশিমবাজারের বৈষ্ণব সম্মেলন শেষ করিয়া যখন ধূলোট উপলক্ষ্যে বহরমপুর শহর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন আমি দেখিয়াছি গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় নিজ সম্প্রদায় সহ কীর্ত্তন করিতেছেন এবং মহারাজ "নরহরির প্রাণগৌর" নামাঙ্কিত স্বর্ণ নির্মিত খুন্তীখানি ধরিয়া রহিয়াছেন ঐ দলের অগ্রভাগে।

ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। আমার জানা দুইটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ করিলাম।

নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রাম। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণের স্থান। এখানে ৪৬৯ গৌরাব্দে নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আনন অলঙ্কৃত করেন। সঙ্গীতাচার্য্য গৌর গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে নিজ গোষ্ঠীসহ সঙ্কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া বৈষ্ণব ও ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

## শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী পত্রিকা

শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী পত্রিকা খানি শ্রীখণ্ড হইতে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৩৭ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহা চালু থাকে।

এই পত্রিকায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সম্পর্কে বহু পণ্ডিত ও গৌরগত প্রাণ ভক্তবৃন্দের গবেষণা-মূলক তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই প্রবন্ধগুলি বৈষ্ণব ধর্ম্মের এবং বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রখ্যাত পণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর এবং কীর্ত্তনাচার্য্য গৌর গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় এই পত্রিকার মূল পরিচালক ছিলেন।

## আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা

উনিশ বিশ শতকে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে রাধিকানাথ রায়, কিশোরী মোহন সেন, গৌরহরি সেন, লোচনানন্দ ঠাকুর, শ্যামাদাস রায়, অমিয়ানন্দ ঠাকুর, দামোদর কবিরাজ, শঙ্কর ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। রাধিকানাথ রায় ছিলেন স্বনামধন্য কবিরাজ রমানাথের কৃতী ছাত্র। প্রখ্যাত চিকিৎসক রাধিকানাথ বহু ছাত্র ও দুঃস্থ রোগীকে অন্ন ও ঔষধ দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

এখন আমার শ্রীখণ্ডবাসী এবং সুধী সমাজের নিকট করজোরে নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই গৌরবোজ্জল শ্রীখণ্ডের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কারে ব্রতী হন।

শ্রীখণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্বন্ধে জানিবার বহু বিষয় আছে যেমন—'ডাক্তার সৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত মহাশয় মুঙ্গের হইতে প্রকাশিত (অধুনা লুপ্ত) 'সমালোচনী' পত্রিকায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীখণ্ডে ২৮৫ জন কবি ছিলেন।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বর্ত্তমান' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সাহিত্যিক ৺জনরঞ্জন রায় মহাশয় 'পঞ্চগ্রাম' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ শ্রীখণ্ডে এক বিবাহ করেন। তিনি শ্রীখণ্ডের ৺ভূতনাথ মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শ্রীখণ্ডে চড়কতলায় নাকি তিনি একটি বসত বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই বাড়ীর দুখানি বড় বড় পাথর ঠাকুর পাড়ায় দুই প্রাক্তন জমিদার বাড়ীতে এখনও বর্ত্তমান।

শ্রীখণ্ডের ২৮৫ জন কবি এবং রাজা রাজবল্লভের শ্রীখণ্ডের সহিত যোগাযোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা যাইতে পারে।

'রত্নপ্রভা' নামক গ্রন্থ কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয় কর্ত্তৃক ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বাঙ্গলা অক্ষরে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ শ্রীনরহরিদাসাদি শ্রীগৌর পার্ষদ-বৃন্দের কুলপরিচয়াদি পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে শ্রীখণ্ড সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

—:::●:::—

# শ্রীখণ্ড পরিচিতি

## শ্রীখণ্ড গ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

### শ্রীসীতানন্দ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাম এই শ্রীখণ্ড। কাটোয়া হতে ৫ মাইল দক্ষিণে ও বর্ধমান হতে ২৮ মাইল উত্তরে কাটোয়া-বর্ধমান রেল লাইনের ধারে গ্রামটীর অবস্থিতি। এই গ্রামের নামেই অঞ্চলের নামকরণ। ৮টী গ্রাম নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। ইউনিয়ন বোর্ডের আমলে ছিল ১২টী গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিমে গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে বর্ধমান-কাটোয়া রেল লাইন প্রসারিত। এখানে দুইটী ষ্টেশন, একটি 'শ্রীখণ্ড', অপরটি 'শ্রীপাট শ্রীখণ্ড।' এই ষ্টেশনের ১।৮ মাইল পশ্চিমে কাটোয়া-বর্ধমান পীচঢালা পাকা রাস্তা। সারাদিনই বাস চলাচল করে; তাই যাতায়াতের খুব সুবিধা। এই রাস্তার পাশেই ব্লক অফিস ও কোয়ার্টারস্ এবং পাশেই চটি। মেইন ষ্টেশনের কাছেও একটি চটি ও ডাক বাংলো আছে। একটি পাথুরে পাকারাস্তা শ্রীখণ্ডের মধ্যস্থল হতে বের হয়ে গ্রামের উত্তর দিক বরাবর বর্ধমান-কাটোয়া রোডে মিশেছে। একটি সাব-ক্যানেল দুভাগ হয়ে গ্রামের পশ্চিম হতে উত্তরে ও পশ্চিম হতে দক্ষিণে বয়ে গিয়েছে। এখানে আছে একটি হেলথ সেণ্টার, একটি ১১ ক্লাস সহ বয়েজ হাইস্কুল, একটি গার্ল'স হাইস্কুল, চারটি প্রাথমিক স্কুল, টেলিফোনের সুবিধা সহ একটি সাব পোষ্ট অফিস, একটি সরকারী

সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার, দুটি ফিজিক্যাল ক্লাব, দুটি প্রাইভেট-ডাক্তারখানা, গো চিকিৎসা কেন্দ্র, ব্লক অফিস, অঞ্চল অফিস, হাট, দুটি রেশন সপ, ও ডি ভি সি রেষ্ট হাউস। তাছাড়া একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি; ঔষধ, মনোহারী, কাপড়, ইলেকট্রিক দ্রব্য, উপহার দ্রব্যাদি, মিষ্টান্ন প্রভৃতির দোকানেরও অভাব নেই। সর্ব্বোপরি আছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। তার জন্য একটি ধান ভানা ও তিনটি গম ভাঙা কলও চালু আছে। পানীয় জলের জন্য আছে টিউবওয়েল।

আয়তন প্রায় ৫২০০ একর। মোট জনসংখ্যা—১০৪০০।

নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভর ক'রে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছি, যথা: ইতিহাস, বিবিধ কুলপঞ্জী, বৈষ্ণবগ্রন্থ, প্রাচীন লিখন, বিভিন্ন মূর্ত্তি ও মন্দির, প্রাচীন উক্তি ও জনশ্রুতি। খণ্ডীয় ঠাকুর বংশের বীজি পুরুষ পন্থ দাশ ও খণ্ডীয় সেন বংশের বীজি পুরুষ রাঘব সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। রাঘব সেনের পুত্র উদয় সেন ছিলেন রাজা লক্ষণ সেনের মিত্র বা সখা। বল্লাল সেনের 'সারস্বত কুল প্রদীপে'ও বীজি পুরুষদের উল্লেখ ও কৌলীন্যের কথা লেখা আছে। অন্যত্র দেখা যায় পন্থদাশ সম্বন্ধে এই উক্তি আছে "অদীক্ষিতশ্চ বৈষ্ণবমন্ত্রেণ পন্থ ঠকুরঃ। বিপ্রাদি সকলান্ বর্ণান্ লোকানুগ্রহ-তৎপরঃ॥"—এবং উদয় সেন সম্বন্ধে বলা হয়েছে "যজ্ঞবিদ্ বহুযষ্টাসৌ যাজনেঽপি বিচক্ষণঃ।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত দাশ ও সেন বংশের আগেও এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে বর্ত্তমান মুসলমান পাড়ার উত্তর ডাঙাপাড়ায় এমন একটী কবর আবিষ্কৃত হয়েছে যা ৪০০।৫০০ বছরের পুরানো বলে মনে হয়।

পুর্ব্বে এখানে সম্প্রদায়গুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাস করত বলে এই গ্রামের নাম খণ্ড গ্রাম। তারপর দুর্জ্জয় দাশ যখন বহু-

স্থানের বহু বৈদ্যকে এনে প্রাধান্য বিস্তার করেন তখন সাময়িকভাবে এই গ্রাম 'বৈদ্যখণ্ড' নামে পরিচিত হয—

"যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যে খণ্ডে ভূগা ভিষক্‌প্রিয়াঃ। বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্বেষামেব বাসভূঃ॥"

• এখন এখানে যে সমস্ত প্রাচীন সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা রায়পাড়ায় রায বংশ ( বীজি গোষ্ঠী সেন বংশ ) কর্ত্তৃক আনীত। ভট্টাচার্য্য পরিবার এঁদের মধ্যে প্রাচীন। এই সেন-বংশ বিক্রমপুরাগত। এঁদের এক পুরুষের নাম বসন্ত সেন। ইনি রায় চৌধুরী উপাধি ধারণ করেছিলেন বা পেয়েছিলেন। বল্লাল সেন রচিত 'সারস্বত কুল প্রদীপে' লিখিত আছে সকল বৈদ্যই বেদোপবেদ পারদর্শী বিষ্ণুপরায়ণ। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু তিনি নিজেই শক্তি (মতান্তরে শিব ) উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁরই পুত্র লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। খণ্ড বাসীরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। কিরূপে শক্তি ও শিব উপাসনা আরম্ভ হ'ল তা ক্রমশ জ্ঞাতব্য। পত্নদাশ পরিবারের কুল-দেবতা গোপীনাথ। এই বিগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তারপর উক্ত পরিবারের পাঁচুদাশ, দুর্জ্জয়দাশ কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হয়ে, "সিংহবাহিনী" প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মধু-পুষ্করিণীর নাম ছিল 'ঘেঁটগড়্যা।' বুধ দাশের পরবর্ত্তী পুরুষ 'ঠাকুর' উপাধি এবং পাঁচু দাশের পরবর্ত্তী বংশধরগণ 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। ঘেঁটগড়্যার নামানুসারে এই পরিবারকে 'ঘেঁট-গড়্যার রায়' বলে।

উপরোক্ত গোয়ীসেন বংশের (বর্ত্তমানে রায়) কুল-দেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ' অদ্যাপি সরকার বাড়ীতে পুজিত হয়েছেন।

পরম বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত শক্তি গোষ্ঠীর চক্রপাণি বিশারদ ছিলেন [illegible]োপাধ্যায় [illegible] শিক্ষাগুরু। দুর্জ্জয়ের পিতা [illegible]

শালী বিশ্বম্ভর দাশ উক্ত পণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে দুর্জ্জয়ের বিবাহ দেন। পরে দুর্জ্জয় স্বপ্নাদিষ্ট যে দেবী মূর্ত্তি উদ্ধার করেন সেই কণ্ঠেশ্বরী (কাঁথেশ্বরী) মূর্ত্তি দুর্জ্জয় বংশের কুলদেবী। কণ্ঠেশ্বরীর পরেই সিংহবাহিনীর প্রতিষ্ঠা। এই সময় খণ্ডের উত্তর দিকস্থ জঙ্গলে আবিষ্কৃত হ'ল খণ্ডের গ্রাম্য দেবতা অনাদিলিঙ্গ 'বাবা ৺ভূতনাথজী'। উক্ত রায় বংশ এই শিবলিঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং আরও বেশ কিছুকাল পরে বর্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত ৺খোষালচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা এই শিবলিঙ্গের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময় হতে তন্ত্র-সাধনার প্রচলন।

এরপর আরম্ভ হয় খণ্ডে নবযুগের সূচনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে তিন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যথা—মুকুন্দ দাশ, নরহরি দাশ ও দামোদর সেন। এই তিন মহাপুরুষের পরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুকুন্দপুত্র ঠাকুর রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন। এই সময় নদীয়ায় উদয় হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। এই খণ্ডগ্রাম তখন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কীর্ত্তনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। নানা স্থান হতে বহু লোকের সমাগম হতে থাকে এবং এই খণ্ডগ্রাম যেন নগরীরূপে প্রতিভাত হয়। তাই খণ্ডগ্রাম হয় খণ্ডপুর।

(১) মুকুন্দদাস—নারায়ণ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ইনি ছিলেন গৌড়েশ্বরের গৃহচিকিৎসক। পরমবৈষ্ণব ও গৌর অনুরাগী। বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে বসে ভজন করতেন। অনন্ত সংহিতায় উল্লেখ আছে "বৃন্দাদেবী প্রাণসখী-শ্রীমুকুন্দঃ কলৌযুগে।" তাঁর নামানুসারে বড়ডাঙ্গার নাম হয় দ্বিতীয় বা গুপ্তবৃন্দাবন। ঠাকুর রঘুনন্দন এই মুকুন্দ দাসের পুত্র।

(২) নরহরিদাস—নরনারায়ণ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র। বহু শাস্ত্রজ্ঞ,

বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ। অনন্ত সংহিতায় উল্লেখ আছে "মধুমতী প্রিয় সখী শ্রীনরহরি সংজ্ঞকঃ॥" তিনি ছিলেন নাগরীভাবে ভজনের প্রবর্ত্তক ও চিরকুমার।

"কৃষ্ণ শক্তিমান আর সবাই শকতি।
সেই কৃষ্ণ পুরুষ আর সবাই প্রকৃতি।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলতেন "গৌর বই আর পুরুষ নেই, নারী বই আর মানুষ নেই।" তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর স্বপ্ন দীক্ষিত (মতান্তরে দীক্ষিত) শিষ্য। তিনি তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতের জন্য সংকীর্ত্তনের অধিকারী ও প্রেমময় ভাবের জন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'সরকার' আখ্যায় ভূষিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে সপার্ষদ মহাপ্রভু রাঢ় ভ্রমণকালে শ্রীখণ্ডস্থ নরহরির গৃহে গমন করেন এবং সেই সময় নরহরির স্পর্শে পূর্ব্বোক্ত 'ঘেঁটগড়্যা'র জল মধুতে রূপান্তরিত হয়। তখন হতে "ঘেঁটগড়্যা' হয় 'মধুপুকুর'। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন তখন প্রতি বৎসর রথের সময় সসম্প্রদায় নরহরি পুরী যেতেন এবং মহাপ্রভুর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভুর আদেশ ছিল রথাগ্রে কৃষ্ণগুণগান করার। কিন্তু নরহরি সে আদেশ লঙ্ঘন করে সসম্প্রদায় গৌরগুণ কীর্ত্তন করতেন এবং মহাপ্রভু সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করতেন। মহাপ্রভু যে নরহরি মদীয়তাময় প্রেমে চিরকালের জন্য আবদ্ধ। নীলাচলে অবস্থানকালে এক সময় 'লোকানন্দাচার্য্য' নামে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপ্রভুকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে বলেন যিনি পরাজিত হবেন তিনি বিজয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। মহাপ্রভু বিনীতভাবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ইঙ্গিতে নরহরিকে তর্ক করতে আদেশ দেন। 'সাধ্য সাধন' বিষয়ে তিন দিন তর্কযুদ্ধে উক্ত পণ্ডিত নরহরির নিকট পরাজিত হন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গৌর বিষয়ক পদাবলীর তিনিই প্রথম রচয়িতা। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু মাধুর্য্য নেই ; তাই মহাপ্রভুর মাধুর্য্য প্রকাশ করতে তিনি শিষ্য লোচনকে 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য লিখতে উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। এইভাবে রাগমার্গের ভজন প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপ্রভু ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ত্রি-ধারায় নিরলস চেষ্টা করে গেছেন ; যথা :—(১) কাব্যের দ্বারা প্রচারণ, (২) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সেবন ও পূজন, (৩) গৌরমন্ত্র উদ্ধার ও পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন। মহাপ্রভুর জীবিতকালে নরহরিই প্রথম 'গৌর বিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পূজাপদ্ধতি প্রচারের জন্য "ভক্তিচন্দ্রিকাপটল" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লোকানন্দাচার্য্যের চেষ্টায় এই গ্রন্থ জগন্নাথ মন্দিরে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যপ্রভু, পণ্ডিত গদাধর সহ গৌরগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এইরূপে লোচন দ্বারা রাগমার্গ ও লোকানন্দ দ্বারা বিধিমার্গ ভজন প্রবর্ত্তিত হয়। ভক্তের দ্বারা ভগবানের প্রতিষ্ঠা—নরহরি তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের জীবন তাঁর ভাবধারাতেই গড়ে উঠে। নরহরির কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকানন্দাচার্য্য, দ্বিজ হরিদাস, দ্বিজ গোপালদাস, (তকিপুর) রামদাস ঘোষাল (এরব্বপুর), গৌরাঙ্গ ঘোষাল, মিশ্র কবিরত্ন, দ্বিজলক্ষ্মীকান্ত সকলেই ব্রাহ্মণ এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা লোচনদাস, সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর, চক্রপাণি রায়চৌধুরী, ও তদীয় পুত্রদ্বয়, নিত্যানন্দ ও জনানন্দ। রায় বাড়ীর আদি পুরুষ নিত্যানন্দ এবং জনানন্দ সরকার বাড়ীর আদি পুরুষ। 'পরকীয়া রসস্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ' গ্রন্থের লেখক ব্রজবাসী গিরিধারী দাসও নরহরির শিষ্য। রঘুনন্দন বংশধরগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত গৌরাঙ্গ মন্দির, ও গৌর বিগ্রহ আজও বৃন্দাবনের

'বাসন্তী' কুঞ্জে বিরাজমান ও পূজিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ন্যায় লোকে তাঁকেও নরহরি চৈতন্য আখ্যা দিয়েছিল। তাঁরও ভজনস্থলী ছিল বড় ডাঙায়। ১০১ বছর বয়সে তিনি উক্ত বড়ডাঙায় গৌর বিগ্রহ সম্মুখে রেখে গোরানাম জপ করতে করতে সদেহে অন্তর্হিত হন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর তাঁর তিরোভাব উপলক্ষ্যে বড়ডাঙায় মহোৎসব হয়।

(৩) দামোদর সেন—ধন্বন্তরী গোত্রীয় বৈদ্য। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি ছিলেন শক্তি উপাসক, দশভুজা ছিল তাঁর পূজিত কুলদেবী। পাশে থাকত শালগ্রাম শিলা। তাঁর বাস ছিল বর্ত্তমান খণ্ডেশ্বরী তলার কাছাকাছি স্থানে। তাঁর সম্বন্ধে উক্তি আছে—

'পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গেবক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥'

কোন এক দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করায় সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে 'অপুত্রক হও' বলে অভিসম্পাত করেন। দামোদরের বিনীত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে পুনরায় বর দেন যে তাঁর এমন এক কন্যা জন্মাবে যাঁর গর্ভে দুই মহাভাগ্যবান পুত্রের আবির্ভাব ঘটবে। পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস হলেন সেই দুই ভাগ্যবান পুরুষ। উক্ত দশভুজাই হচ্ছেন খণ্ডেশ্বরী এবং এখনো রায় বংশ দশভূজার নিত্য সেবা করছেন।

(৪) চিরঞ্জীব ও সুলোচন—দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা। জাতি বৈদ্য। পূর্ব্বে বাড়ী ছিল গঙ্গাতীরস্থ কুমারনগরে। দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দার সঙ্গে চিরঞ্জীবের বিয়ে হয়। দুজনেই নরহরির খুব অনুগত ও গৌরভক্ত ছিলেন। তাঁরা প্রতি বৎসর নরহরির সঙ্গে পুরী যেতেন। উভয়েই ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও

পণ্ডিত। পুত্রদ্বয় ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও নরোত্তম ঠাকুরের মিত্র।

(৫) রঘুনন্দন—মুকুন্দদাসের পুত্র ও মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্র। তাঁর সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর উক্তি—

"সদানবদ্যং মদনস্বরূপং খণ্ডে নিজং শ্রীরঘুনন্দনাখ্যং।

প্রকাশ্য রাধাদ্যুতি ভাব ভাগ্ যো ন্যাসী বভূ বেহ স পাতু কৃষ্ণঃ ;"

রঘুনন্দনকে মদনের অবতার বলা হয়। নীলাচলে মহাপ্রভু নিজ কোলে বসিয়ে সকল ভক্তগণ সম্মুখে তাঁর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে সংকীর্ত্তন উৎসবে 'দধি ভাণ্ড' ভঞ্জনের অধিকার দিয়েছিলেন। ইনি শিশুকালে গোপীনাথকে নাড়ু খাইয়েছিলেন এবং বড়ডাঙ্গায় অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর মন্ত্র-শিষ্য। বর্ত্তমান ঠাকুর পরিবার রঘুনন্দন পরিবার বলে আখ্যাত। তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি সুললিত ছন্দে 'গৌর ভাবামৃতস্তোত্র' রচনা করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস ঠাকুর (আকাইহাট), প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিতীয় বিদ্যাপতি শ্রীকবি রঞ্জন (শ্রীখণ্ড), পদকর্ত্তা পাপিয়াশেখর (শ্রীখণ্ড) পূর্ব্বোক্ত চক্রপাণি রায় চৌধুরীর ভাই মহানন্দ রায় চৌধুরী। ইনি ছিলেন চির কুমার। নরহরি প্রদত্ত 'বৃন্দাবন চন্দ্র' বিগ্রহ এখন এই রায় বাড়ীতে নিত্য সেবিত হচ্ছেন। রসকল্পবল্লী গ্রন্থ প্রণেতা রামগোপাল ও তাঁর পুত্র রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণেতা পীতাম্বর দাস এই রায় পরিবারের সন্তান ও রঘুনন্দন বংশীয় ঠাকুর রতিকান্তের শিষ্য। সেই সময় এখানে কাত্তিক ভট্টাচার্য্য নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর 'পঞ্চ মুণ্ডির' আসনটী বর্ত্তমান বয়েজ হাই স্কুলের সীমানার মধ্যে থাকায় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ সযত্নে সেই আসন

রক্ষা করছেন। পূর্ব্বোক্ত পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখরের বাড়ী ছিল খণ্ডেশ্বরী তলায়। তাঁর সেবিত বিগ্রহের নাম 'রসিক রায়'। তাঁর গুরু-ভাই দ্বিজ গোপাল দাস সেই বিগ্রহ তকিপুরে নিয়ে যান। উক্ত 'রসিক রায়'কে খণ্ডেশ্বর বলা হত। ৺দুর্গানারায়ণ গাঙ্গুলী খণ্ডেশ্বরী তলার দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর পোষ্য পুত্র বংশীয়গণ এখন আর প্রতিমা পূজা করেন না, করেন ঘট পূজা। কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করায় সদানন্দ সরকার ভূতনাথ তলায় 'সিদ্ধেশ্বরী দেবী' প্রতিষ্ঠা করেন। আর একটি পুণ্যস্থান কালিতলা। পশ্চিমে রেল লাইনের পশ্চিম দিক হতে পূর্ব্বে বৈরাগীতলার মাঠ পর্য্যন্ত এই খণ্ডপুর বিস্তৃত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শে ও পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ-গণের আবির্ভাবে খণ্ডপুর শ্রীযুক্ত হয়ে শ্রীখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় আত্মরক্ষার জন্য খণ্ড খণ্ড গ্রাম একত্র হয়ে এক অখণ্ড গ্রামে পরিণত হয়। ৺ভূতনাথ জীউর মন্দির নির্ম্মাণ করান রাজা রাজবল্লভ রায়। মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে:

৺শ্রীশ্রীভূতনাথায় নমঃ

"প্রাসাদং সমকারয়ৎ পরমমুং শ্রীভূতনাথস্য বৈ।
যোঽগ্নিষ্টোম মহাধ্বরাদি মখজৎ যো বাজপেয়ীক্ষিতৌ॥
দাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভো নৃপোঽম্বষ্ঠবেবিন্দাদার্য্য সং।
শাকে তর্ক মহীধ্ররাগরজনী নাথে চ মাঘে মিতে॥"

তর্ক ৬ মহীধ্র-৭ রাগ-৬ রজনীনাথ-১

জনশ্রুতি:—(১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বৃন্দাবন হতে প্রথম নদীয়া যাত্রাকালে এক রাত্রি নরহরির গৃহে অবস্থান করেন। (২) শ্রীখণ্ডে প্রায় ২৮৫ জন কবি জন্মগ্রহণ করেন। (৩) রাজা রাজ-বল্লভ রায়ের অন্যতমা মহিষী শ্রীখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত রায় চৌধুরী

বংশের কন্যা। (৪) বর্ধমানরাজ আসল প্রতাপচাঁদ ষড়যন্ত্রে জাল প্রমাণিত হয়ে যখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন কিছুদিন ৺রাজেন্দ্র-কৃষ্ণ রায়েদের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। (৫) ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ৺জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের গৃহে রবীন্দ্রনাথ এক রাত্রি অবস্থান করেছিলেন।

৺ডি, গুপ্ত, ৺গণনাথ সেন, ৺কালিদাস রায় মহাশয়গণের আদি বাসস্থান ছিল এই গ্রামে। এখানকার দুটি উৎসব প্রসিদ্ধ। নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব (বড় ডাঙ্গার উৎসব) ও শিবের গাজন। অনাদিলিঙ্গের প্রতিনিধি-স্বরূপ কাশী হতে আনীত ও অভিষিক্ত দুধকুমার শিব দিয়ে এই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব অনধিক ২০০ বছরের প্রাচীন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা পরলোকগত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে এই ইতিহাস শেষ করছি:

(১) পণ্ডিত গৌরাঙ্গ সেন, (২) পণ্ডিত, সুকবি ও সুগায়ক গোপীনাথ কবিরাজ (৩) প্রখ্যাত কবিরাজ রাধিকানাথ রায় (৪) পণ্ডিত ও সুগায়ক রাধিকাবিলাস ঠাকুর (৫) প্রথম যুগের গ্রাজুয়েট ও দার্শনিক জগদীশ গুপ্ত (৬) জমিদার সচ্চিদানন্দ ঠাকুর (৭) জমিদার ও স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা কৃষ্ণলাল মজুমদার (৭) জমিদার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রায় (৮) উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী রায় সাহেব অনুকূলচন্দ্র মল্লিক (৯) কুমিল্লা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক (১০) সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর (১১) অদ্বিতীয় পণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী (১২) পণ্ডিত ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া গৌরগুণানন্দ ঠাকুর (১৩) কৃষ্ণনাথ কলেজের সাময়িক অধ্যাপক ও শ্রীখণ্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার সেন (১৪) মহাত্মাজীর সহচর ও বহরমপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় (১৫) কাশিমবাজার রাজ

-এষ্টেটের সর্ব্বাধ্যক্ষ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় (১৬) প্রখ্যাত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক (১৭) প্রখ্যাত ডাক্তার তারানাথ চৌধুরী, সুধাংশুশেখর রায় ও যতীন্দ্রচন্দ্র রায় (১৮) পণ্ডিত ষষ্ঠীদাস ঘোষাল (১৯) পণ্ডিত রাখালদাস ভট্টাচার্য্য (২০) সুকবি সচ্চিদানন্দ ঠাকুর (২১) শিক্ষাবিদ ও কবি শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক (২২) সমাজসেবী কামাক্ষ্যাচরণ মজুমদার (২৩) ডাঃ পঞ্চানন চৌধুরী (২৪) কবিরাজ লোচনানন্দ ঠাকুর (২৫) গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সভাপতি অমিয়ানন্দ সরস্বতী (২৬) গোবিন্দচন্দ্র হালদার (২৭) শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২৮) নাগরী বাবাজী প্রভৃতি। ভবিষ্যতে বিশদভাবে এই ইতিহাস লেখার ইচ্ছা রইল।

—:#:—

# শ্রীখণ্ড (বর্ধমান)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

**কয়েকজন বিখ্যাত প্রাচীন ব্যক্তি ঃ**

কবি দামোদর—অনুমান ১৪৮০ খ্রীঃ বর্তমান ছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব সেনের শ্বশুর ছিলেন।

"দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁ হো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥"

—ভক্তিরত্নাকর

চিরঞ্জীব সেন ও সুলোচন সেন—অনুমান ১৫০৭ খ্রীঃ বর্তমান ছিলেন। ইঁহারা শ্রীখণ্ডের পাঁচজন প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যের অন্যতম।

দানবীর সদানন্দ সরকার—অনুমান খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। কথিত হয়, তখনকার বর্ধমানাধীপ তাঁহার দানের যশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরহিতে ব্যয় করিবার জন্য প্রচুর আয়ের সম্পত্তি শ্রীখণ্ড গ্রামটি দান করিতে চান, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সদানন্দের বিরাট ভিটার কয়েকটি থাম মাত্র এখন বর্তমান। শ্রীখণ্ডের লোকে বলিয়া থাকেন, এখানে সদানন্দের হাতিশালা ছিল। তাঁহার প্রপৌত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী এখন সেই বংশের ধারা রক্ষা করিতেছেন।

গোবিন্দদাস (পদকর্তা)—অনুমান ১৫২৭ খ্রীঃ তিনি জীবিত ছিলেন। কবি দামোদরের দৌহিত্র ও চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বলরাম দাস—পিতা আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী। জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া নিত্যানন্দদাস নাম লয়েন। 'প্রেমবিলাস' ব্যতীত, 'বীরচন্দ্র চরিত', 'গৌরাঙ্গষ্টক', রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত' ও 'হাট বন্দনা' নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১৫৩৭ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন অনুমান করা যায়।

রামগোপাল চৌধুরী—মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা রতিকান্তের শিষ্য। 'নরহরিশাখা নির্ণয়' ও 'রঘুনন্দনশাখা নির্ণয়' প্রণেতা। তাঁহার পুত্র পীতাম্বর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ প্রণেতা। রামগোপালের বৃদ্ধ প্রপিতামহ চক্রপাণি চৌধুরী, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রামগোপাল ১৫৭৩ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন অনুমান করা যাইতেছে। ইঁহারা সকলেই শ্রীখণ্ডবাসী ও বৈদ্যশাখান্তর্গত ছিলেন। ইঁহাদের পর এক শত বৎসরে আরও বহু পদকর্তার জন্ম হয়। (১৮)

প্রেমানন্দ ঠাকুর—আন্দাজ ১৮৩৭ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম। প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি সকল লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া পড়িতেন। ঋণ করিয়াও দান করিতেন।

জগদীশ্বর গুপ্ত—জন্ম মেহেরপুরে ১৮৪৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে। ১৩ বৎসর বয়সে শ্রীখণ্ডের চৌধুরী গোষ্ঠীতে, বাহারবন্দরের দেওয়ান রাধানাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা জয়কালী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় বসবাস করেন। প্রবেশিকা হইতে বি-এল পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। মুন্সেফ হইয়া বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। 'সটীক চৈতন্য চরিতামৃত', 'লীলাস্তবক', 'চৈতন্যলীলামৃত'

---

(১৮) শ্রীখণ্ডের ২৮৫ জন বৈষ্ণব পদকর্তার বিবরণ অধুনালুপ্ত 'সমালোচনী' নামক মাসিক পত্রিকায় (১৯১৪ খ্রীঃ), ডাঃ গৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রকাশ করেন।

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এবং অধুনালুপ্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া, খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন সে সময়ের শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে বৈষ্ণব-ধর্মে আকৃষ্ট করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ৮ই জুলাই যকৃৎ সংক্রান্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কাটোয়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত সেকালের প্রত্যেক বৃহৎ 'চটি'তে জলাভাব নিবারণের জন্য এক একটি বড় কূপ খনন করাইয়া দেন। তিনি শ্রীখণ্ডের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপুত্রক অবস্থায় তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার বিদুষী পরোপকারব্রতী সহধর্মিণী, গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ করিতে ভূতনাথ তলায় একটি ইন্দারা খনন করাইয়া দেন এবং ঐস্থান দিয়া কাটোয়ার কাঁচা রাস্তাটি বর্ষায় চলাচল করা অসম্ভবপ্রায় হইলে, সেখানে একটি পাকা সাঁকো প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাঁহারা ব্রহ্মাচারনিষ্ঠ ছিলেন।

গোপীনাথ কবিরাজ—আন্দাজ ১৮৫৭খ্রীঃ তাঁহার জন্ম। ৪৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অশেষ শাস্ত্রপারঙ্গম ছিলেন এবং অপূর্ব সঙ্গীতকলাকুশলী ছিলেন।

সর্বানন্দ ঠাকুর—গৌরগতপ্রাণ ভক্তিশাস্ত্রে পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। জন্ম ১৮৬০খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯১২খ্রীঃ। স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল মজুমদার উকিল মহোদয়, স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মুন্সেফ মহোদয় ও স্বর্গীয় প্রেমানন্দ ঠাকুর মহোদয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মাইনার বিদ্যালয়টি ইঁহার সময় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

রাখালানন্দ ঠাকুর—বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত নৈষ্ঠিক নিরহঙ্কার ঠাকুরবংশ-ভূষণ এই মহাত্মা নবদ্বীপে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। শ্রীখণ্ডে ১৮৬৭খ্রীঃ তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্রনাম স্তোত্রের সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ, শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা-পটলের টীকা ও বঙ্গানুবাদ, হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংস্কৃত

প্রকরণের টীকা, হংসদূতের সম্পূর্ণ টীকা, 'রসামৃতসিন্ধু শেষ' নামক মূল গ্রন্থ, শ্লোকমালা ও পদাবলী রচয়িতা। 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকায় লিখিত ইঁহার প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেয়। ইঁহার সহিত শ্রীখণ্ডের ভক্তিশাস্ত্রের টোলটি উঠিয়া গিয়াছে। ইনি ঠাকুর বংশের 'মধুমতী সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর পিতার ধারা রক্ষা করিতেছেন।

কবিরাজ রাধিকানাথ রায় ও কবিরাজ অক্ষয়কুমার রায়—সুচিকিৎসক ছিলেন।

কৃষ্ণলাল মজুমদার—মেদিনীপুরের উকিল ছিলেন। তিনি গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

গোপাল ভট্টাচার্য ও তৎপুত্র নীলমণি ভট্টাচার্য—ইঁহারা কৌলাচারী ও দেবীসিদ্ধ ছিলেন। কার্ত্তিকনাথ ভট্টাচার্য—দেবী সাক্ষাৎ করেন বলা হয়।

বক্রনাথ শিরোমণি—বড় পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ বংশের দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য শিরোমণির পুত্র শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীখণ্ডের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের কুলপুরোহিত। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের পৌরোহিত্যের ও কাব্যের পরীক্ষক।

ন্যায়বাগীশ বংশের নৃসিংহদাস ঘোষাল ও ষষ্ঠীদাস ঘোষাল খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন।

### কয়েকটি স্থানীয় ঘটনা :

রাজা রাজবল্লভের আগমন—রাজা রাজবল্লভ রায় ১৭৫৫খ্রীঃ জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী (মাঘ) মাসে ভূতনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীখণ্ডে আসেন—পূর্ব্বেই ইহা উল্লেখ করিয়াছি।

চড়কতলার ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ—চড়কতলার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি।

উহা পতিত-ডাঙ্গা ছিল। অর্থাৎ সেখানে উচ্চ ঢিপি ছিল। সেই ঢিপি কাটিয়া যখন সমতল করিয়া ফসলের-জমি করিবার জন্য শ্রীখণ্ডের ভূতপূর্ব পত্তনীদার (উত্তরপাড়ার স্বর্গগত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) চেষ্টা করেন, কাটিতে কাটিতে তখন ৩৬টি পাথরের থামযুক্ত একটি অসমাপ্ত প্রাসাদ বাহির হইয়া পড়ে। সকলেই আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে থাকেন, ইহা কাহার রাজপ্রাসাদের চিহ্ন? আমাদের অনুমান হয়, ইহা কিংবদন্তীমূলে শ্রুত সেই রাজা রাজবল্লভের অসমাপ্ত প্রাসাদ। এই প্রাসাদের একটি প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ স্বর্গগত রাধিকানাথ ঠাকুর মহাশয় লইয়া গিয়া নিজ আলয়ে রাখিয়াছিলেন। তাহা এখনও তথায় আছে।

চন্দ্রশেখরের কাটামুণ্ডে হরিনাম—খণ্ডেশ্বরীতলায় রায় চন্দ্রশেখরের বাড়ী ছিল। চন্দ্রশেখর নাম জপ করিতে ছিলেন, এমন সময় ঠগীরা একদল গ্রামবাসীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছিল। ঠগীরা চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করে, যে লোকগুলি পলাইল তাহারা কোন পথে গিয়াছে? চন্দ্রশেখর তখন নামজপে এতই তন্ময় ছিলেন যে, ঐসব লোক কোন পথে চলিয়া গেল তাহা দেখেন নাই। চন্দ্রশেখর ঐসব লোকের সন্ধান দিতে না পারায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঠগীরা তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলে। সেই কাটা মাথা হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকে।

মণীন্দ্রচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রথম "বৈষ্ণব সম্মেলন"—শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশের প্রতি মহারাজা বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। কারণ বংশপ্রতিষ্ঠাতা কান্ত মুদী মহাশয় এই ঠাকুর বংশের ধামপ্রাপ্ত নৃসিংহানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী, ধামপ্রাপ্ত প্রেমানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। এই কারণে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় শ্রীখণ্ডেই প্রথম "বৈষ্ণব সম্মেলনে'র (১৯১২খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে) শুভারম্ভ করেন।

**দর্শনীয় স্থান ঃ**

প্রধান কয়েকটি স্থানের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাকী কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মধুপুষ্করিণী—নরহরি সরকার ঠাকুরের আবাসের নিকট ঘেঁটু-গড়িয়া নামে একটি সামান্য জলাশয় ছিল। ঘেঁটুগড়িয়া নাম হইতেই বুঝা যায় (ঘেঁটু ফুল ফুটিত যে গড়িয়ায়) ইহা কিরূপ অপরিচ্ছন্ন ও ক্ষুদ্র জলাধার ছিল। কিন্তু ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন, সেই ক্ষুদ্র গড়িয়াটি অমৃত-হ্রদ মধু-পুষ্করিণীতে পরিণত হইল বৈষ্ণবের ভাবরাজ্যে। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরি সহ সেই গড়িয়ায় স্নান করিতে নামিলেন। প্রেমানন্দে মত্ত নিতাই. স্নান করিতে করিতে নরহরিকে বুঝি বলিয়াছিলেন—'তুমি তো ব্রজের মধুমতী .. তা' আমায় মধু পান করাও না।' নরহরি তখন হস্তস্থিত ভাজনে সেই গড়িয়ার জল ভরিয়া নিয়া নিতাইকে পান করান। নিতাইও মধুজ্ঞানে সেই জল পান করিয়া পরম তৃপ্ত হন। সেই দিন হইতে ঘেঁটুগড়িয়া মধু পুষ্করিণী নামে খ্যাত হইল।

ভক্তিরত্নাকরে আমরা এই বিবরণের সমর্থন পাই। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীখণ্ডে আসিলে—

"নিত্যানন্দ প্রভু যথা নর্তন করিলা।
প্রেমের আবেশে যথা মধুপান কৈলা।"......

ইহাতে নিত্যানন্দপ্রভু যেখানে মধুপান করেন, জাহ্নবা সে স্থান দর্শন করেন উল্লিখিত হইয়াছে।

পাঁচ মহান্তের 'গাদি'—মুকুন্দদাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচনের গাদি।

রাধাকৃষ্ণলীলারসপূর গ্রন্থে আছে—

"শ্রীখণ্ডের ভাগ্য নাহি ধরে অন্য গ্রাম।
নরহরি যাহাতে হইল উপাদান॥

শ্রীমুকুন্দ আর প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
অবতরিয়াছে চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥"

পঞ্চমুণ্ডের আসন—দক্ষিণ বাড়ীর ঠাকুর মন্দির মধ্যে একটি, বড়ডাঙায় একটি, ব্রাহ্মণ পাড়ায় একটি ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট একটি পঞ্চমুণ্ডের আসন আছে।

দেউল—গৌর-গোপীনাথের, মদনগোপালের, মদন ঠাকুরের, গোবিন্দ জীউর দেউল, শিবের জোড়ামন্দির ও চৌধুরীদের চণ্ডী মণ্ডপ। অন্যান্য দেউলের বিবরণ প্রসঙ্গতঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

**স্থানীয় গীতোৎসব :**

বৈশাখ মাসে নামের গান—নিত্য রাত্রিতে ঠাকুর মহোদয়গণ স্বরচিত পদাবলী গাহিয়া শ্রীখণ্ড ভ্রমণ করিতেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে গোষ্ঠলীলা কীর্তন—ঠাকুর মহোদয়গণ স্বরচিত গীন গাহিয়া ঐভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিতেন।

পূজার সময় কবির গান—ঠাকুর মহোদয়গণ দুর্গাপূজার সময়ও ঐভাবে স্বরচিত গানের সম্প্রদায় লইয়া চৌধুরীদের দুর্গামণ্ডপে, কর্তারায়দের দুর্গাপ্রতিমার নিকট ও সিংহবাহিনীর নিকট কবির গান গাহিতেন।

চড়কের গান—চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কতলায় ঠাকুর মহোদয়গণ কালোয়াতী গান গাইতেন।

**শিক্ষা সংস্কৃতি :**

গ্রামে একটি সংস্কৃত টোল বর্তমান। পণ্ডিতপ্রবর রাখালানন্দ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্য ঠাকুরবংশের হস্তেই ন্যস্ত আছে। গ্রামের একমাত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি

প্রধানভাবে উক্ত বংশের উৎসাহী যুবক শ্রীমান নিত্যানন্দ ঠাকুরের যত্নে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতেছে। ইহা ছাড়া দুইটি পাঠশালা ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা এখানে কম নহে। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে দিতেছি—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এল, শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর, রায় বাহাদুর শ্রীশঙ্করদাস মজুমদার বি-এল, শ্রীফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-এ, বি-টি, বি-এল, ডাঃ শ্রীসুখেন্দুকুমার রায় এম-বি (ডেপুটী-সুপার ক্যাম্বেল হাসপাতাল), ডাঃ শ্রীকালিদাস মল্লিক এম-বি, ডাঃ শ্রীনারায়ণদাস গুপ্ত এম-বি, শ্রীকানাইনাথ চৌধুরী এম-এ (একাউণ্ট অফিসার), শ্রীষড়ানন গুপ্ত বি-এল, শ্রীমুনীন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এল, ডাঃ শ্রীপ্রমথ-নাথ গুপ্ত এল-এম-এফ, ডাঃ শ্রীতারকনাথ মল্লিক এল-এম-এফ, শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ বি-টি, বি-এল, শ্রীসতীনাথ মল্লিক এম-এ, শ্রীঅমিয়কুমার চৌধুরী এম-এ, শ্রীনরহরি কবিরাজ এম-এ, শ্রীশচী-নন্দন সেন বি-এ, শ্রীগোরাশশী সেন বি-এ, শ্রীনদীয়ানন্দ ঠাকুর বি-এ, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক বি-এ, শ্রীনীরোদবরণ গুপ্ত বি-এ, শ্রীসুবোধকুমার রায় বি-কম্, শ্রীতারাগতি গঙ্গোপাধ্যায় বি-কম্, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এ, শ্রীসুহাসকুমার রায় বি-এস-সি, বি-এল, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এল, শ্রীসুধীশকুমার রায় বি-এল, শ্রীসুনীল কুমার রায় বি-এল, শ্রীতারকনাথ গুপ্ত বি-এ, শ্রীসুধাংশুকুমার রায় বি-এ, শ্রীকমলেন্দুকুমার রায় বি-এস সি, শ্রীকাশীনাথ গুপ্ত বি-সি-এস, শ্রীগৌরচন্দ্র মল্লিক এম-এ, বি-সি-এস, ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক এল-এম-এফ, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এ, অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু-কুমার রায় এম-এস-সি, কবিরাজপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, কবিরাজ শ্রীদামোদর কবিরাজ কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-তীর্থ, কবিরাজ শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর কাব্যতীর্থ, কবিরাজ অমিয়ানন্দ ঠাকুর কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ, কবিরাজ নলিনীনাথ গুপ্ত, কবিরাজ

শ্রীশ্যামদাস রায় আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ, কবিরাজ শ্রীরমণীমোহন সেন আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ প্রভৃতি প্রায় সকলেই বৈদ্যশাখান্তর্গত এবং বিদেশে কার্যব্যপদেশে আছেন।

শ্রীখণ্ডে অবস্থানকারীদের মধ্যে শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এল মহাশয় সর্ব্বপ্রাচীন। ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম। তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সেক্রেটারী ও বাহারবন্দরের দেওয়ান ছিলেন। এক্ষণে পরম ভাগবত, তাবৎ গীতা গ্রন্থখানি আবৃত্তি করিতে পারেন। বাণী ও লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদপূত তাঁহার বৃহৎ সংসার। শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীখণ্ডে অবস্থানকারী ঠাকুর বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। জন্ম শ্রীখণ্ডে ১৮৮২ খ্রীঃ। বৈষ্ণবাচার্য ধামপ্রাপ্ত শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রধানভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষা করেন। নরহরি সরকার ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত' লোকানন্দ আচার্যের 'ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়' ও 'নরহরিশাখা নির্ণয় প্রকাশ করেন। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থ প্রণেতা। দক্ষিণখণ্ডের রাধানন্দ ঠাকুরের নিকট ও নবদ্বীপের ধামপ্রাপ্ত পণ্ডিতবাবাজীর নিকট গড়েনহাটী গান শিখেন। ধামপ্রাপ্ত ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর নিকট এবং আখুরিয়া হরিদাসের নিকট মনোহরসাহী গান শিখেন। রেনেটী গানের শেষ বিখ্যাত কীর্তনীয়া বেণীদাস গৌরগুণানন্দের প্রথম যৌবনে ধামপ্রাপ্ত হন, সেজন্য তাহাতে তিনি পারদর্শী শিক্ষকলাভের সুযোগ পান নাই। এক্ষণে মনোহরসাহী ও গড়েনহাটী গানের অন্যতম প্রধান আচার্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক, অন্য দুইটি পুত্র শ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর এবং শ্রীমান সীতানন্দ ঠাকুর ও শ্রীহরিদাস কর কীর্তনগানে বিশারদ—সকলেই গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের ছাত্র। হরিদাস কর এক্ষণে রেডিও শিল্পী।

**কতিপয় গ্রন্থকার ঃ**

কলিকাতা প্রবাসী কবিরাজপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রণীত 'দর্শন-সমুচ্চয়' গ্রন্থ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য। শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত এম-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, উচ্চগণিতের একখানি পুস্তক ( কণ্টাক্ট এণ্ড করভেচার সিরিজ অন দি প্রপারটিজ অভ দি কেলিয়ন অফ নোডেল কিউবিক ) প্রণেতা এবং 'অবতারী গৌরসুন্দর' নামক পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী আছেন। শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ বি-টি, বি-এল, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। শিক্ষাবিষয়ের কতিপয় পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীনরহরি কবিরাজ এম-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও ঐরূপ পুস্তক প্রণেতা। কাল্না উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅজিতনাথ গুপ্ত 'দার্শনিকের প্রেম বিজয়' নামক ইংরাজী ও বাঙলা পুস্তক প্রণেতা। শ্রীখণ্ডের জনপ্রিয় স্বভাব কবি শ্রীসচ্চিদানন্দ ঠাকুরের বহু কবিতা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'গন্ধরাজ' নামে একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় অধ্যাপক গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম-এ মহোদয়ের রচিত ইংরাজী পুস্তক শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ( কৃষ্ণ-কল্ট্ ) এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ইংরাজী কবিতায় 'শকুন্তলা' লেখেন।

---

'বর্ত্তমান পত্রিকা হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত।

—::*::—

# শ্রীখণ্ড চৈতন্যদায়িনী সভা

( সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র )

—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঠাকুর

'শ্রীখণ্ড চৈতন্যদায়িনী সভা' বিগত সন ১৩২১ সালে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ ও ভদ্র মহোদয়ের উদ্যোগে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সালার ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ণ সমর্থনে উক্ত সালের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীখণ্ড চৈতন্যদায়িনী সভার সদস্যগণ।

১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী।
শ্রীখণ্ডসর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।

২। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দ্বারিকানন্দ ঠাকুর।
সম্পাদক, শ্রীখণ্ড চৈতন্যদায়িনী সভা।

৩। সহ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সেনগুপ্ত এম, এ
শ্রীখণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার।

৪। সদস্য—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ঠাকুর

৫। সদস্য—শ্রীযুক্ত গৌরগুনানন্দ ঠাকুর

৬। সদস্য—পণ্ডিত বসন্ত কুমার বিদ্যাভূষণ
অধ্যাপক কীর্ণাহার চতুষ্পাঠী

৭। সদস্য—পণ্ডিত গোপেন্দ্র কুমার স্মৃতিতীর্থ
অধ্যাপক, গঙ্গাটিকুরী চতুষ্পাঠী

৮। সদস্য—পণ্ডিত পঞ্চানন বেদান্ত শাস্ত্রী
অধ্যাপক খাটুন্দী চতুষ্পাঠী

৯। সদস্য—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ঠাকুর
ভাগবৎ-বিশারদ কাটোয়া

এই নয়জন একত্রে মিলিত হইয়া সন ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীখণ্ড সংস্কৃত টোলবাটী গৃহে শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একমতে প্রথম সভা হয়। ঐ বৎসর আষাঢ় মাসে বোর্ডের কমিটীর সদস্যগণ শ্রীখণ্ড চৈতন্য-দায়িনী সভার অনুমোদন পান।

সন ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীখণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং বাং সন ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত এই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

সন ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাসে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে সংস্কৃত পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এবং শ্রীখণ্ড কেন্দ্রে ছাত্র সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় শ্রীখণ্ড কেন্দ্র তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং ১৩৩৬ সালেই শ্রীখণ্ড কেন্দ্রে পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

——::*::——

# জ্ঞান চর্চ্চা

—শ্রীরামানন্দ ঠাকুর

শ্রীখণ্ড গ্রামের বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পরিচয় শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈদ্য কূলে দামোদর নামক একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রশস্তি একটী শ্লোক পাওয়া যায় যথা—

পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবি

শুনা যায় নবদ্বীপ ভারতবর্ষের একটী শিক্ষা কেন্দ্রের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজকে পরাজিত করিয়া একজন মৈথিলী দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক শ্রীখণ্ডে আসিয়া উক্ত দামোদর কবির সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, দামোদর উক্ত নৈয়ায়িককে বিচারে পরাজিত করিলে ক্রুদ্ধ নৈযায়িক দামোদর কবিকে বংশহীন হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন। তাঁহাতে মধ্যস্থ পণ্ডিতগণ উক্ত নৈয়ায়িক ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যায় অভি-সম্পাত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন 'দামোদরের পুত্রাদি বংশানুক্রম না থাকিলেও দৌহিত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞানগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।' উক্ত দামোদরের দৌহিত্র চিরঞ্জীব ও সুলোচন মহাপণ্ডিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি ভাব সাধনার সমর্থক হিসাবে মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। মাধবী গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজ ঠাকুর নরহরি, মুকুন্দ, রঘুনন্দন প্রভৃতি মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদগণ শ্রীখণ্ড গ্রামের অধিবাসী। প্রবাদ আছে ঠাকুর নরহরিই প্রথম গৌরাঙ্গতত্ত্বে ঈশরত্ব আরোপ করিয়া ভাব সাধনার অনুকুল স্তোত্র ও পদাবলী রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর নরহরির পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বংশে অনেক পণ্ডিত ও সাধক লোক-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শচীনন্দন ঠাকুর, জগদানন্দ, বাণীনাথ, নৃসিংহানন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ঠাকুর বংশীয় ছাড়া ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য কুলোদ্ভব অনেক পণ্ডিত শ্রীখণ্ডে বাস করিতেন। তাঁহাদের পৃথক পৃথক টোলে তাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন। ঘোষালদের বিদ্যা-বাগীশের টোল, ঘোসাল ভট্টাচার্য্যের টোল, গোপীনাথ কবিরাজের টোলের কথা প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে শুনিয়াছি। পরবর্ত্তী বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে এতদঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সংসারত্যাগী বৈষ্ণব ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। ঐ চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, পাণিণী, কলাপ, হরিনামামৃত যে ছাত্র যাহা পড়িতে ইচ্ছা করিত যে সেই ব্যাকরণই পড়িতে পারিত। তাহা ছাড়া কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, স্মৃতি এবং ন্যায় শাস্ত্রও পড়ান হইত। আমি নিজেও ঐ চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলাম। অধ্যাপক সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয় হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং অধ্যাপক রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় সংক্ষিপ্ত সার, মুগ্ধবোধ, পাণিণী ও কলাপ ব্যাকরণের এবং সাংখ্য ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বেদান্ত, কাব্য, সাংখ্য ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যায়ী ছাত্রদিগকে ব্যাকরণের ছাত্রদিগের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপনা করিতে হইত। তাঁহারা ব্যাকরণের আদ্য ও

মধ্য পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ও রাখালানন্দ ঠাকুর একান্নবর্ত্তী খুড়তুত জ্যেঠতুত ভাই ছিলেন। তাঁহাদের যৌথ কিছু জমীদারী ছিল এবং সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয় কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুরুপুত্র ছিলেন। তাঁহাদের সাংসারিক সচ্ছলতা থাকায় শিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে ৪।৫ জনকে খাদ্য ও বাসস্থান নিজেরাই দিতেন।

উক্ত চতুষ্পাঠীর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বনওয়ারী জীবন গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিতেন; বিভূতিনাথ চক্রবর্ত্তী, শিবরাম অধিকারী, ভরত বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু চক্রবর্ত্তী, ক্ষেত্রনাথ কবিরাজ প্রভৃতি কিছু সংখ্যক ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া বিভিন্ন ইংরাজী স্কুলে সংস্কৃত পণ্ডিতের পদে কাজ করিতেন। অনেক ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া কবিরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আরও গৌরবের কথা বিধিনাথ নামক একটী জন্মান্ধ নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকে বাসস্থান ও খাদ্য দিয়া কেবল শ্রুতি ও ছাত্রের স্মৃতি শক্তি প্রভাবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইয়া ব্যাকরণের উপাধি পাশ করাইয়াছিলেন।

উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ও রাখালানন্দ ঠাকুর সুপণ্ডিত, সুকবি ও সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়নের পর কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহারা অন্যান্য শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহার অধ্যাপনা করিতেন। রাখালানন্দ ঠাকুরের সকল শাস্ত্রের ছাত্র নবদ্বীপ বিবুধ জননী সভায় পরীক্ষার্থী হওয়ায় উক্ত সভা তাঁহাকে 'অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া বেতন-ভোগী পণ্ডিত রাখিয়া স্বর্গীয় গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের অধ্যয়নের জন্য নিত্যানন্দ দাস নামক একজন সদাচারী সুপণ্ডিত ও সুকবি দ্বারা আর একটী টোল পরিচালিত হইত;

তাহাতেও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর নৃসিংহ বিলাস ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্যের এবং কবিরাজ রাধিকানাথ রায়ের টোলেও ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কবিরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ান হইত।

এইরূপে এখন হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বাবধি শ্রীখণ্ডগ্রাম সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান চর্চ্চার পীঠস্থান রূপে গৌরবান্বিত ছিল। উক্ত সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্যতীর্থ উপাধি অর্জন পূর্ব্বক এবং অন্যত্র কবিরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় রামচন্দ্র মল্লিক, লোচনানন্দ ঠাকুর, দামোদর প্রসাদ কবিরাজ, অমিয়ানন্দ ঠাকুর, শ্যামাদাস রায় প্রভৃতি অনেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অনেক ছাত্র পৌরোহিত্য, কথকতা এবং অধ্যাপনাও করিতেন।

# শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৩৩৪ সাল শুভ পহেলা বৈশাখ রবিবার। স্থান শ্রীখণ্ড। এখন যেখানে শ্রীখণ্ড উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ঠিক তার পশ্চিমে অর্থাৎ ৺শম্ভুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাসভবন যেখানে, সেখানে ছিল ৺রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের একটী কোঠা বাড়ী। সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসেছে একটী অনাড়ম্বর অথচ মহতী জনসভা। সভায় ২০০ হতে ২৫০ লোক উপস্থিত। নিঃশব্দে সভার কাজ চলছে। সভার উদ্যোক্তা কতিপয় তরুণ ও যুবক। তরুণদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৺নিত্যানন্দ রায় (বাদল), ৺অবনীনাথ গুপ্ত, ৺দামোদর কবিরাজ, ৺অমিয়ানন্দ ঠাকুর, স্বরূপানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি এবং যুবকদের মধ্যে ৺শ্যামানন্দ ঠাকুর, ৺খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺কামাক্ষ্যাচরণ মজুমদার, ৺সচ্চিদানন্দ ঠাকুর, ৺বলাইনাথ চৌধুরী, ৺শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর, শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর ইত্যাদি। যথারীতি 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে সভা আরম্ভ হল. সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশী গৌরবর্ণ কৃশতনু ভাবাবিষ্ট গম্ভীর অথচ মৃদুহাস্যময় এক পুরুষ। ইনি বঙ্গবাসীর সকলের পরিচিত স্বনামধন্য পল্লীকবি ৺কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহোদয়। বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত ৺রাখালানন্দ ঠাকুর রচিত একটী সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে সভা আরম্ভ হল। সভার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। উদ্দেশ্য শ্রীখণ্ড গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপন। স্থানীয় ২-৩ জন তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন এবং তারপর উঠলেন সভাপতি.

যাঁর অভিভাষণ শোনার জন্য সকলে আগ্রহে অপেক্ষমান। অভি-ভাষণ শেষে জন্মগ্রহণ ক'রল একটী শিশু পাঠাগার; জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামকরণ। তখন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুধু একটী নাম—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সভাপতি মহাশয় সেই নামেই পাঠাগারের নামকরণ করলেন; সকলেই সন্তুষ্ট এই নামে। নিম্নলিখিত ছত্র দিয়ে সভাপতির অভিভাষণ সমাপ্ত হল:

"চির সমুজ্জ্বল রবে শ্রীখণ্ডের শ্রী।
কেহ চেষ্টা করিও না করিতে বিশ্রী॥
দেবতা মানুষ রবে পাশাপাশি ঘর।
আধেক মানুষ তাহে আধেক অমর॥

—'কুমুদরঞ্জন'

'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গান শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ হল সভার কার্য্য। সভার মধ্যেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাঠা-গারের কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হলেন; সভাপতি ৺সচ্চিদানন্দ ঠাকুর, সম্পাদক ৺অবনীনাথ গুপ্ত ও অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ৺শ্যামানন্দ ঠাকুর। পূর্ব্বোক্ত কোঠাবাড়ীর নীচের তলায় স্থাপিত হল এই নোতুন গ্রন্থাগার। সহৃদয় গ্রামবাসীরা দান করলেন বই, আলমারী র‍্যাক ও অর্থ। আন্দাজ ৩০০-৪০০ বই নিয়ে আরম্ভ হল গ্রন্থা-গারের কাজ। কালের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলল স্থান, কর্ম্মকর্ত্তা ও কলেবর পরিবর্ত্তন। এইভাবে এল শুভ ইং ১৯৫৮ সাল যে বছরে চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির পেল সরকারী স্বীকৃতি। তারপর সরকারী দাক্ষিণ্যে ও গ্রামবাসীর দানে নির্ম্মিত হয় পাঠাগারের নিজস্ব ভবন; কুঁড়ে ঘর থেকে দেউলে। তখনকার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সভাপতি—শ্রীঅমিয়নাথ চৌধুরী, সম্পাদক ৺অমলেন্দুশেখর

রায় ও বেতনভুক গ্রন্থাগারিক শ্রীকৌমুদীভূষণ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য সভ্যগণ। ইং ৬।১১।৬০ তারিখে এই নব ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী ও খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারের ভাণ্ডারে আছে মোট পুস্তক আনুমানিক ৫৩০০, সংবাদপত্র দৈনিক—২, মোট সভ্য সংখ্যা—১৮৭, দৈনিক পুস্তক লেনদেন গড়—৫৪, পাঠাগারে বসে পাঠ করেন দৈনিক গড়—৩২ জন।

সম্পাদক, চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির

—:※:—

## শ্রীখণ্ডবাসী স্বনামধন্য কীর্ত্তন শিক্ষক শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়

—শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজী

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগদাধর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট প্রথম কীর্ত্তন শিক্ষা করিতাম। তারপর তিনি বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন। ওই বাবাজী মহারাজের খোঁজেই বৃন্দাবন হইতে বাংলায় আসিলাম। শুনিলাম বাবাজী মহারাজ শ্রীখণ্ডে ঠাকুর

মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছেন। আমি এবং আর একজন বাবাজী কীর্ত্তন শিখিবার জন্য শ্রীখণ্ডে আসিলাম। তখন দেখিলাম ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবনের বাবাজী মহারাজের নিকট কীর্ত্তন শিখিতেছেন। আমিও সেই সঙ্গে বাবাজী মহারাজের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বে কয়েকজন ছাত্র কীর্ত্তন শিক্ষা করিত। বাবাজী মহারাজ আসিবার পর তাহারা এবং আমরা সকলেই তাঁহার নিকটেই শিক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমার এবং বাবাজী মহারাজের আহার এবং বাসস্থানের ভার ঠাকুর মহাশয় নিজেই লইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আমাদের রন্ধনাদি করিত এবং 'ভাঙ্গাবাড়ী' নামে তাঁহার যে কাছারী বাড়ী ছিল সেখানেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তখন বাংলা ১৩৩৭-৩৮ সাল। এইভাবে ৮ মাস আমরা শিখিলাম। তারপরে বাবাজী মহারাজ মুর্শিদাবাদে একটি সঙ্গীত শিক্ষার বিদ্যালয় ( টোল ) খুলিলেন। তখন আমরা সকল ছাত্র শ্রীখণ্ডে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে মুর্শিদাবাদে বাবাজী মহারাজের ওই প্রতিষ্ঠানে যাইয়া কীর্ত্তন শিখিতে লাগিলাম। লালপুরের নিকট রসুনপুর গ্রামে রসিক মণ্ডলের বাড়ীতে ওই প্রতিষ্ঠানটি হইয়াছিল। এক বৎসর আমরা ওখানে ছিলাম। এক বৎসর পর বাবাজী মহারাজ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। তারপর পুনরায় আমি শ্রীখণ্ডে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কীর্ত্তন শিখিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। আমার কীর্ত্তন শিখার বাকী অংশটুকু ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ, দান, মান, গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, কলহন্তরিতা ইত্যাদি যেগুলি আমার অভাব ছিল সেগুলি বুঝিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন ঝুলন, রাস তাঁহার নিকট ভাল নাই।

ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন শিখাইবার ধরণ কিছু বলি। তিনিই আমাদের খাওয়াইতেন। ঘোষের কাছে আমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করিয়া দাম নিজে দিতেন। ইহা ছাড়া বলা ছিল যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমার ভাণ্ডার হইতেই লইবে।

তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ বাপু, আমার যা ছিল তা তো তোমাদেরই দিলাম। পরে এই শ্রীখণ্ডের জিনিষ যদি আমার ছেলেদের কিছু শিখাতে পার তাহলে আমার জিনিষ এখানে কিছু থাকে।"

ঠাকুর মহাশয়ের নিজের কীর্ত্তন শিক্ষা গ্রহণের কথা কিছু বলি। দুপুরে প্রসাদ পাইবার পর ২টা ২॥ টায় বাবাজী মহারাজের নিকট বসিতেন। শিক্ষা গ্রহণ চলিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আমরাও সঙ্গে থাকিতাম। ঠাকুরের আরতি শেষ হইবার পর আবার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত শিক্ষা চলিত। বাবাজী মহারাজ যখন বলিতেন, "পরিশ্রম বড় বেশী হইতেছে। তাহাতে ঠাকুর মহাশয় বলিতেন, "আমি আপনাকে পাইব কোথায়? আপনি তো বৃন্দাবন চলিয়া যাইবেন। আমি ঠাণ্ডা তেলের ব্যবস্থা করিতেছি, আরও দুধের ব্যবস্থা করিতেছি।" এই ভাবেই ব্যবস্থা হইত এবং শিক্ষাগ্রহণ চলিত। কিছু দিন পর আমি ওই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরে যখন আবার ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিতে গেলাম তখন দেখি শ্রীহরিদাস কর মহাশয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করিতেছেন।

ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন শিক্ষার কথা এক মুখে কত আর বলিব? ভরণ পোষণ দিয়া এমন ভাবে শিক্ষাদানের গুরু কজন পাওয়া যায়?

বংশ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যলীলার পরিকর শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মহাশয়ের বংশধর এই ঠাকুর মহাশয়। সেই ধারাকেই ইনিও রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

## কীর্ত্তন শিক্ষার জন্য ছয়গাঁও হতে শ্রীখণ্ড

—হরিদাস কর

ইংরাজী ১৯১৭ সাল হতে জরাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চার দেওয়ালে আবদ্ধ বন্দীর জীবন যাপন করছি। তিন বছর হবে এই ধামে এসেছি। উদ্দেশ্য ধামেশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ চিহ্নিত স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করা।

আমার কীর্ত্তন শিক্ষার আচার্য্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিত্য-নিরঞ্জন কবিরাজ ( নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ) মহাশয় তদীয় ছাত্র বর্ত্তমানে ঐ স্কুলের শিক্ষক মাধ্যমে ছোট্ট একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পত্র পড়ে দেখি আমার কীর্ত্তন গুরু শ্রীমৎ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রসঙ্গে এবং কীর্ত্তন বিষয়ে কিছু লেখার নির্দেশ।

যে কোন প্রসঙ্গ লিখতে হলে যে জাতীয় যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন তার কিছুই এই লেখকের নাই। অনধিকার-চর্চা হলেও প্রসঙ্গটির লোভ ছাড়া গেল না। কীর্ত্তন সংগীতকে মদীয় আচার্য্য যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছেন বা অনুশীলন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন এমনটি রাঢ়-মণ্ডলে আর কোথাও ছিল বলে আমার জানা নাই। বহু গায়কের নিকট তিনি গান শিখেছিলেন বলে তাঁর কাছে জেনেছি। যাঁদের নাম করেছিলেন তাঁরা হলেন—শ্রীলত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী, গদাধর দাস বাবাজী, গৌরগোপাল দাস ইত্যাদি এই সব গুণীজনদের বাড়ীতে রেখে এছাড়া আরও অনেকের কাছেই তিনি কীর্ত্তন শিক্ষা করেছিলেন।

পৌনে পাঁচশ বছরের পূর্বেও শ্রীখণ্ডগ্রাম সংস্কৃত ও সংগীত-শিক্ষার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীমন্ নরহরি সরকার ও তৎ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমন্ রঘুনন্দন ঠাকুর প্রসঙ্গে মহাজন পদে পাই যথা "সঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী, হইলেন ঠাকুর নরহরি, বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।" এছাড়া আরও বহু প্রাচীন পদে শ্রীখণ্ডের উল্লেখ আছে।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ উপাসনার ফল-স্বরূপ বৈষ্ণব মহাজনকৃত পদাবলীসমূহ স্মরণ মনন বৈষ্ণবীয় সাধনার অঙ্গ বা উপাস্য প্রাপ্তির উপায়রূপে জানা যায়। শ্রীশ্রীভগবৎ লীলা মাধুর্য্যের আস্বাদনই ছিল আচার্য্যের কীর্ত্তনানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য—তাই তিনি সারা জীবন এই সংগীতের সাধনায় অতিবাহিত করেছেন। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে পড়ে কখনও কোথাও যান নাই। বিষয়াদির মধ্যে থেকেও ঠাকুর ছিলেন বনবাসী বৈষ্ণবের ন্যায় ত্যাগী।

আমার কীর্ত্তন শিক্ষার আগ্রহ অতি শৈশবেই হয়েছিল। বর্ত্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলায় মাদারীপুর সাঃ ডিঃ; তদধীন ভেদের গঞ্জ থানান্তর্গত ছয়গাঁও ছিল বাড়ী। সাত আট বছর বয়সে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিতাবলম্বনে কীর্ত্তন সংগীতে স্বাধীন শিল্পী জীবন আরম্ভ হয়। বছর দশ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলের প্রচলিত সংগীতাদি করে কাটিয়েছি। উনিশ বছর বয়সে আজ থেকে ৪২শ বৎসর পূর্ব্বে সংগীত শিক্ষার জন্য ঘরের বাহির হয়েছিলাম।

কীর্ত্তন শিক্ষার ব্যাপারে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই ছিল। যাইহোক প্রতিকূল বাধা অতিক্রম করে মাঘোৎসবকে উপলক্ষ্য করে নবদ্বীপ ধামে এসেছিলাম। এই উৎসবটিকে কীর্ত্তন উৎসবও বলা যায়; কারণ রাঢ়-মণ্ডলের বহু প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়া এসময় শ্রীধামে

এসে প্রতি মন্দিরে মন্দিরে কীর্ত্তন গীত পরিবেশন করে থাকেন আমি তৎকালের বহু কীর্ত্তনাভিজ্ঞ শিল্পীর গান শুনে শ্রীযুৎ অবধুত বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের কাছে যাব স্থির করে দোল পূর্ণিমার পরে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী মুর্শিদাবাদ জিলার শক্তিপুর গ্রামে গিয়েছিলাম। শিক্ষার ব্যাপারে কোন সুযোগ সুবিধা ওখানে হলনা বটে কিন্তু আচার্য্যের সন্ধান পেলাম ঐ গ্রামের শ্রীশিবদাস ঘোষ ( অন্ধ গায়ক ) কীর্ত্তন সংগীতের এক অভিজ্ঞ গায়ক ছিলেন, তাঁরি কাছে। তিনি আমার কথা শুনে কথা-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে শ্রীখণ্ডে শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

শক্তিপুর হতে কাটোয়া হয়ে শ্রীখণ্ড গ্রামে গিয়ে আচার্য্যের কাছারী বাড়ী পোঁছাতে এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সাক্ষাৎ পেতে কোনই অসুবিধা হয়নি। আমার কীর্ত্তন শিক্ষার অভিপ্রায় জেনে সেই দিনই তিনি শিক্ষা আরম্ভ করে দিলেন।

অধিবাস পর্য্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গান "জয়রে জয়রে গোরা" বিলম্বিত দশকোশি তালে নিবদ্ধ। প্রথমতঃ এই গানটি শিখতে বেশ কষ্টকর মনে হয়েছিল; তাই একটু বেশী সময় লেগেছিল। একুশ দিনে গানটি শিক্ষা শেষ করে একটু চঞ্চল ও চিন্তিত হয়েছিলাম; কীর্ত্তন শিক্ষা হবে কিনা ভেবে। আমার মনের অবস্থা বুঝে শ্রীলঠাকুর মহাশয় বললেন 'তুমি ধৈর্য্য ধরে শিখে যাও, তোমার কীর্ত্তন হবে। এবংবিধ আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে শিক্ষা বিষয়ে খুবই উৎসাহ পেয়েছিলাম।

প্রথম গানটি ছাড়া পরবর্ত্তী গানসমূহ শিখতে আমার তেমন খুব কষ্ট হয়নি; কারণ কীর্ত্তন গীতের প্রচলিত তালগুলির সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। নামান্তর ছাড়া বিভাগাদি একই প্রকার বহু তাল পেয়েছি কৃষ্ণ-কমল গীতিকাব্যের গানে।

যেমন—লোফা-একতালী, তেওট-রূপক, যৎ-দোঠুকী, ৭ মাত্রা। এমনি অনেক তাল বিভাগই জানা ছিল।

শিক্ষার সময়—মধ্যাহ্নের আহারান্তে বেলা ১২টা হতে ৫-৩০টা পর্য্যন্ত, তারপর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌর গোপীনাথ অঙ্গনে আরতি কীর্ত্তনান্তে তিনি ১।১-৩০ ঘণ্টা বিভিন্ন পদাবলী প্রত্যহ কীর্ত্তন করতেন; এছাড়া শীতের দিনেও রাত্রির আহারান্তে ২।৩ ঘণ্টা গান শিখাতেন। সাকুল্যে ১৬।১৭ ঘণ্টা প্রতিদিন গান বলেছি বা শিখেছি।

পর্ব্বগান সমূহ যথা;—রাস, ঝুলন, হোলি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসবের ১।১ মাস পূর্ব্বে শিখাতেন। আচার্য্যের স্নেহ ও যত্নে অতি অল্প সময় মধ্যে অর্থাৎ সাকুল্যে দুই বৎসর সময় শ্রীখণ্ডে শিক্ষার জন্য ছিলাম।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নির্দেশে ঐ সময়ে মহাজন-পদাবলী কণ্ঠস্থ করা এবং শ্রীখোল যন্ত্রের সঙ্গে গায়ন রীতির ধারণা হয়েছিল। এই দুটি বিষয়ে যে দুজন জ্ঞানী ও গুণী আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীমৎ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী (ঠাকুরের খুল্লতাত) ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজ (সম্পর্কে ঠাকুরের আত্মীয়)। পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থে সম্পাদনার ভুল-ভ্রান্তি হেতু বহু পদে পাঠ-বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় যা এখনও বহু গ্রন্থে দেখা যায়। লিপি প্রমাদ ও পাঠবিকৃতি যখনই মনে হয়েছে তখনি শ্রীমৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গিয়ে পদের সঙ্গতি, পূর্ণ অর্থ এবং প্রয়োজনবোধে পাঠ পরিবর্ত্তন করে নিয়েছি। শ্রীমৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীহস্ত লিখিত পাদ পূরণ, শব্দ পুরণ পাঠ এখনও আমার খাতায় আছে।

নমুনা রূপে কয়েকটি পদ যথা;—"এ ধনী মানিনী করহ সঞ্জাত" কহি সাচ বাত্ত। পাঠ পরিবর্ত্তন করেছিলেন "চলত্ত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলী খুরলি গানরি।"

এই পদে পুর্ব্বাপর বিচার করে পাঠ দিলেন—খেলত রাম সুন্দর শ্যাম, মোহন মুরতী মধুর ধাম, পাঁচনি কাঁচনি বেত্রবেণু মুরলী খুরলী গানরি। পদটি গোষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত। "চাঁদ মুখে বেণু দিয়া" এই পদের শেষ স্তবকের "দিয়া আবা আবা ঘন" স্থলে দিয়া হৈ হৈ ঘন। "নবহুঁ রুচি মেহ" স্থলে নবহুঁ রুচি দেহ। এমনি বহু পদের পাঠ পরিবর্ত্তন করে দিয়েছিলেন এবং কোনও পদের পাঠ পরিবর্ত্তন করতে হলে কি জাতীয় বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার তাহাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন গীতে শ্রীখোল বাজাতেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজ ( শ্রীখণ্ড )। প্রায় প্রতিদিনই সকালবেলা ইনি ঠাকুরের কাছারী বাড়ী আসতেন এবং আমার গানে সঙ্গত করে লয়, প্রস্তুতি, পরণ, মাতন, ঘাত প্রবন্ধ, মান, মূর্চ্ছনা শ্রীখোল বাদ্যের আঙ্গিক রীতি পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা দিয়েছিলেন।

আমার কীর্ত্তন শিক্ষার সময়ে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, একচক্রা, ঝামুট-পুর, জাজিগ্রাম ইত্যাদি স্থানে উৎসবানুষ্ঠানে তৎকালের কীর্ত্তন গায়কদের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং আমার শিক্ষাগত পরিমাপ করার সুযোগও ঘটেছিল। ৺অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গনেশ দাস, শচীনন্দন ঘোষ, গৌরগোপাল দাস, ফটিক চৌধুরী, যদুনন্দন দাস ইত্যাদি বহু কীর্ত্তন গায়কের স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলাম। এত সংখ্যক গান কেমন করে শিখালেন বা শিখলাম এই প্রশ্নও অনেকেই করেছেন। শিক্ষা শেষে দেশে গিয়ে দু-বছর ছিলাম তারপর কলকাতায় আমার কর্ম্মস্থল ঠিক করে চলে এসেছিলাম। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর শ্রীমন্ নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীখণ্ড গিয়েছি, আজ তিন বৎসর শারীরিক কারণে যেতে পারছি না॥

# সঙ্কীর্ত্তনাচার্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর

—শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ (মথুরা)

শ্রীখণ্ডের অপর স্পর্শমণি সঙ্কীর্ত্তনাচার্য্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সৌভাগ্যবশে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ স্নেহ প্রীতিলাভ ঘটে। প্রাচীন জাতীয় মহাজনীয় বহু ছোটবড় বিচিত্র সুরতালে তিনি দক্ষ ছিলেন এবং 'রামপদ দাদা' প্রভৃতি কয়েকজন গুণী ছাত্রও তিনি তৈয়ার করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্কীর্ত্তন রসসাগর গদাধর দাস দাদাজী মহারাজের নিকটে গান শিখিয়াছিলেন বলিয়া যেমন শুনিয়াছি, তেমনি গদাধর দাস দাদাজীকেও নানা বিচিত্র সুরতালের গান শিখাইয়াছিলেন বলিয়াও আমার শুনা আছে। প্রাচীন কীর্ত্তনধারা লুপ্ত হইতেছে দেখিয়া ঐ প্রৌঢ় বয়সেও তিনি তাহা রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিয়াদিয়া ও সঙ্গত করাইয়া দিতে আলস্য করিতেন না। আমি বৃন্দাবনে গদাধর দাস, যদুনন্দন দাস, ভক্তিচরণ দাস, রামদাস প্রভৃতি মহাত্মাদের সঙ্গ করিয়া কিছু কিছু কীর্ত্তন অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও নিকটে 'ভৃঙ্গতালের' কোনও গানের সংবাদ পাই নাই। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে উক্ত গানখানির সন্ধান পাইয়া সযত্নে তাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম। বৃন্দাবনের চাঁপাঠাকুরের (নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়) গুরুদেব শৃঙ্গার বটের ব্রহ্মানন্দ প্রভু, যিনি গোয়ালিয়র ঘরাণার বিরাট ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার নিকট থেকে অপূর্ব্ব ধরণের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কীর্ত্তন শিখিয়াছিলাম। তাহা কেহ রক্ষা করিলনা দেখিয়া বহু যত্নে তাহা

আয়ত্ত করিয়াছিলাম বলিয়া শ্রীখণ্ডের লোচনদাসের ঐ সম্পদ রক্ষার জন্য সঙ্কীর্ত্তনাচার্য ঠাকুর মহাশয় আমাকে অতিশয় প্রীতি করিতেন। এমনকি আমার দোহার, বায়েন প্রভৃতি না থাকায় তিনি নিজে তাঁহার ছাত্রদের সহিত আমার গানে সহায়তা করিয়া এবং তাঁহার বাদক পুত্রকে দিয়া বাদ্যের সাহায্য করিয়া শ্রীখণ্ডে মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে অন্ধ শিবদাস ওস্তাদের উৎসবে সমবেত কীর্ত্তনাচার্য রাধেশ্যাম প্রভৃতি গুণীগণের মধ্যে আমাকেই প্রেরণা ও সাহায্য দিয়া মহাপ্রভুর লীলা কীর্ত্তন করাইয়া যে আনন্দ ঐ বিশাল জনগণকে দিয়াছিলেন তাহা আমার ধারণাতীত। তিনি ও গদাধরদাস দাদামহারাজের ন্যায় সুকণ্ঠ ও ভরাট গলার গরাণহাটী ঘরাণার গান করিতেন। তালের দিক থেকে তিনি অধিক পটু ছিলেন, তাহা একবার তাঁহার গানে বাজাইবার কালে একখানি মধ্যম দশকুশীর আড়িঘাঁত বাজাইলে দোহারেরা হঠাৎ বিভ্রান্ত হইয়া গান ছাড়িয়া দিলে তিনি স্বয়ং গান রক্ষা করিয়া অতিস্নেহে আমাকে বলিলেন, 'তুমিতো গায়েন ও পণ্ডিত বলিয়া জানি, কিন্তু তুমি এমন বায়েন তাতো জানিতাম না।' সঙ্কীর্ত্তনাচার্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় যে একজন রাঢ়ের প্রখ্যাত গুণগ্রাহী ও গুনী ছিলেন, তাঁহার খ্যাতি এই সুদূর বৃন্দাবনেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য গদাধর দাসজী প্রভৃতির অবর্ত্তমানে অনেককে শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে গিয়া গান শিখিবার পরামর্শ করিতেও শুনিয়াছিলাম।

বস্তুতঃ নরহরির পাদপূত শ্রীখণ্ড ভূমি রত্নগর্ভা; এখানকার ঠাকুরবংশ তাহারই ফসল। কবিরাজ লোচনানন্দ ঠাকুর দাদা মহাশয় ও অতি বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ এবং সঙ্কীর্ত্তনানন্দ ও নৈষ্ঠিক ভজনশীল মহাত্মা ছিলেন। আমি কলিকাতায় তাঁহার

বাসায়ও কিছুকাল ছিলাম এবং বড়ডাঙ্গার উৎসবেও আসিয়াছিলাম। তিনি প্রতি বৎসর উক্ত উৎসবে যোগ দিতে সকল বাধাকেই উপেক্ষা করিতেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কীর্ত্তনটির সংরক্ষণের জন্য তিনিও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, কালের প্রভাবে বৈকুণ্ঠ-বৈভব ইদানীন্তন লোকের ভাগ্যাতীত। যদি ঠাকুর-বংশে উৎপন্ন কেহ অতি সত্বর সে চেষ্টা করেন তবে হয়ত রক্ষিত হইবে। নতুবা এ অপূর্ব্ব সম্পদ কালগ্রস্ত হইবে এবং কিরূপ বস্তু পূর্ব্বে ছিল তাহার আভাসও পরবর্ত্তী কেহ জানিতে পারিবে না।

## পণ্ডিত ৺গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কীর্ত্তনাচার্য্যের কীর্ত্তন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান

—শ্রীসীতানন্দ ঠাকুর

"গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণীরাগে ব্রজরস করিতেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা প্রভু গৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ॥"

মহাজনের এই দুই ছত্র হতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের আগেও শ্রীখণ্ডে কীর্ত্তন সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। এই কীর্ত্তন হয়ত তখন পালাগানে সুসংবদ্ধ ছিল না। পালারূপে

কীর্ত্তন গানের প্রথম প্রচলন হয় শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সময় হতে। বহু মহাজনের স্মৃতি বিজরিত সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান এই শ্রীখণ্ডে পালাবদ্ধ কীর্ত্তন গানের প্রচলন হয় শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর রঘুনন্দনের প্রচেষ্টায়। পদরচনা, সংস্কৃতশিক্ষা ও কীর্ত্তনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যে এই শ্রীখণ্ড তা ইতিহাস কর্ত্তৃক স্বীকৃত। এই কীর্ত্তন সঙ্গীত পত্র-পল্লব-ফুল-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে ৺গৌর গুণানন্দের প্রচেষ্টায় ও সুপণ্ডিত ৺রাখালানন্দ শাস্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতায়।

"লীলারস সংকীর্ত্তন বিকশিত পদ্মবন
জগত ভরিল যার বাসে।

উক্ত ত্রিবিধ ঐতিহ্যবাহী শ্রীমন্নরহরি পরিবারের একটী শাখায় ১২৮৮ সালে ৺গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁর মা ছিলেন গোপাঙ্গনা দেবী—কোমলপ্রাণা সাংসারিক অনভিজ্ঞা মহিলা। তাই শৈশবে গৌরগুণানন্দ পিতৃহীন হলে জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি পরিচালনার সঙ্গে গৌরগুণানন্দকে প্রকৃত মানুষ করে গড়বার ভার পড়ে তাঁর বিধবা অপুত্রক জ্যেঠাইমা মহীয়সী মহিলা ৺কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণীর উপর। মাইনর স্কুলের পাঠশেষে তাঁকে সংস্কৃত ও তৎসহ আচরণবিধি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ খণ্ডবাসী সুপণ্ডিত ৺নিত্যানন্দ দাস বৈরাগ্যকে নিয়োগ করা হয়। মায়ের স্নেহ, জ্যেঠাইমার একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পণ্ডিত মশায়ের সুশিক্ষার গুণে কৈশোরেই ঠাকুর মশায়ের চরিত্রে পূর্ণমানবতার লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কীর্ত্তন পরিমণ্ডলের সুপ্রাচীন পরিবেশে পুষ্ট হওয়ায় তাঁর মনে জেগে ওঠে কীর্ত্তন শিক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি। তখন শ্রীখণ্ডে ৺গৌরাঙ্গ সেন, ৺গোপীনাথ কবিরাজ ও ৺রাধিকাবিলাস ঠাকুর এই তিনজন একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ ও কীর্ত্তন সংগীত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সগৌরবে বিরাজমান।

তাঁদের কাছেই ঠাকুর মশায়ের কীর্ত্তনে হাতেখড়ি হয় এবং তিনি অধিবাস, দধিহরিদ্রা, হরিবাসর, প্রভাতী, শীতলারতি, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, গুরু-বন্দনা, দেহতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, নাম মাহাত্ম্য, বড়ডাঙ্গা পর্য্যায় সহ বিবিধ লীলারসের বিশেষ বিশেষ গান শিক্ষা করেন। এ বিষয়ে ৺রাধিকাবিলাসের দানই সর্ব্বাধিক।

সেই সময় শ্রীখণ্ডে একটী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রথা চালু ছিল। ভদ্র বংশজ দুটী দলে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শাক্তে, চলত কবির লড়াই শারদীয়া পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে। বিভিন্ন বিষয়ে স্বরচিত বিভিন্ন তালের গানের দ্বারা চলত উত্তর প্রত্যুত্তর। এই রকম একটী দলের মূল গায়ক ছিলেন উক্ত গৌরগুণানন্দ। এতে তাঁর মাত্রা, তাল ও সুরের জ্ঞান বেশ পুষ্ট হয়েছিল। কোন দলের মূল গায়ক তিনি, আশা করি পাঠকের তা বুঝতে কষ্ট হবে না।

তারপর আরম্ভ হয় "যুগল ও গোষ্ঠ" গানের আসর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধর ৺পঞ্চানন ঠাকুরের পরিচালনায়। প্রথম প্রথম ঠাকুর মশায় ছিলেন তাঁর প্রধান দোহার। সারা বৈশাখ মাস ধরে ৩।৪ খানি স্বরচিত পদে সুরারোপ করে প্রতি সপ্তাহে দুদিন কীর্ত্তন হত ছয়টী আসরে আর পথ পরিক্রমার পদটী হত অবশ্যই তেহট তালে। বাকী দিনগুলি চলত মহড়া। এতেও একই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। ভাল কাজের প্রতিযোগিতা আরও ভাল; তাতে ভাঙনের চেয়ে গঠন-প্রবণতা বেশী থাকে। বৈশাখী সংক্রান্তিতে হত যুগল গান অর্থাৎ স্বরচিত পদে বিভিন্ন সুর ও তালের রাস কীর্ত্তন। দিন ১০।১৫ পরে হত গোষ্ঠগান যে কোন ১টী মহাজনী লীলা কীর্ত্তন। মূল গায়ক ছাড়া সকলের পরিধানে থাকত হলুদ বর্ণের কাপড়। তাছাড়া ছিল আটা সোটা ও নিশান বাহী লোক। সুন্দর পরিবেশ, ততোধিক

সুন্দর কীর্ত্তন শোভাযাত্রা। প্রতিযোগিতার খাতিরে ভিন্নস্থান হতে ওস্তাদ মূলগায়েন ও বায়েন আমদানী করা হত। ঠাকুর মশাই এই সুযোগে বিভিন্ন পালার অজানা বা পছন্দমত গানগুলি আয়ত্ত করে ফেলেন। এতেও ঠাকুর মশায়ের কীর্ত্তন পিপাসা মেটে না।

• তখন ব্রজ ও বঙ্গভূমি নানা কীর্ত্তন-তারকায় সমুদ্ভাসিত। অন্যতম বিশিষ্ট তারকা আঁখুরে হরিদাসকে গৃহে রেখে কতকগুলি গান আয়ত্ত করে নেন। তার কিছুকাল পরে তিনি সপরিবারে যান তীর্থ পরিক্রমায়। পথে বৃন্দাবনে তিনি বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি তৎকালীন ব্রজ ও বঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনাচার্য্য ৺অদ্বৈত দাস বাবাজী (পণ্ডিত বাবাজী) মশায়ের নিকট কতকগুলি বিশিষ্ট বড়তালের গান শিক্ষা করে আসেন। সেই সময় বাবাজী মশায়ের সুযোগ্য শিষ্য প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া মধুকণ্ঠ ৺গদাধর দাস বাবাজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং তাঁকে শ্রীখণ্ডে আগমনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। শ্রীখণ্ডে ফিরে এসে তিনি তাঁর বৈঠকখানা সংলগ্ন "বৈষ্ণব খণ্ড" নামে একটী পৃথক মহলে একটী সংকীর্ত্তন-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ৺ত্রিভঙ্গ দাস বাবাজী মশায়কে আমন্ত্রণ জানান শ্রীখণ্ডে আসতে। এই ত্রিভঙ্গ দাসই বর্ত্তমান একচক্রা ধামের আদি রূপকার। ঐ সময় বর্ধমান জেলার অণ্ডালের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুর বাড়ীতেও কীর্ত্তনের মহা-সমাদর। শ্রীখণ্ড ও দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুরগণ একই বংশসম্ভূত। শ্রীখণ্ডের তিন জন উক্ত ঠাকুরবাড়ী হতে সঙ্গীত ও মৃদঙ্গ শিক্ষা করে শ্রীখণ্ডে ফিরে আসেন। তন্মধ্যে ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধু ৺সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজ অন্যতম। তাঁর মত সুন্দরবোধ-সম্পন্ন মৃদঙ্গবাদক আমরা কমই দেখেছি। ইনি বরাবর ঠাকুর মশায়ের প্রধান মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। বাকী দুজন, যাঁরা কীর্ত্তন শিক্ষা করে এসেছিলেন,

তাঁরা উভয়েই ঠাকুর মশায়ের বৈবাহিক। তাঁদের কাছেও ঠাকুর মশায় দক্ষিণখণ্ড ঘরানার ভাল ভাল অজানা গান আয়ত্ত করে নেন। তারপর আসেন ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী। তিনি তখন পাঁচ-থুপীতে থাকতেন; তাই প্রায়ই আসতেন আবার চলে যেতেন। তাঁর কাছেই ঠাকুর মশাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গান শিক্ষা করেন। শেষদিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন আর দুটী অমূল্য রত্নকে যাঁদের নাম আজও কীর্ত্তন সমাজে সুপরিচিত। একজন বীরভূম জেলার 'ঠিবা' গ্রামের ৺অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদঙ্গাচার্য্য। তিনি পাখোয়াজেও সমান ওস্তাদ ছিলেন বলে তাঁর মৃদঙ্গ সঙ্গতে এক বিচিত্র তরঙ্গ সৃষ্টি হত। অন্যজন প্রসিদ্ধ মূল গায়ক ৺শচীনন্দন দাস। ইনি ঠাকুর মশায়ের কাছে কিছু বড় তালের গান শিখেছিলেন। পরে তাঁর পুত্র মুর্শিদাবাদ জেলার স্বর্ণহাটী গ্রামের সুকণ্ঠ মূল গায়ক ৺কমল দাসও শ্রীখণ্ডে এসে ঠাকুর মশায়ের কাছে অনেক গান শিক্ষা করে যান। একবার উক্ত ত্রিভঙ্গ দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শচীনন্দন দাসের শ্রীখণ্ডে অবস্থান কালেই এসে উপস্থিত হলেন গদাধর বাবাজী। সেকি উন্মাদনা, কি আনন্দ! শ্রীখণ্ডের আকাশ বাতাস গানে গানে মুখরিত। সর্ব শ্রেষ্ঠ তারকার সমাবেশ ঘটেছে সেই 'বৈষ্ণবখণ্ডে'। 'বৈষ্ণবখণ্ড' নাম সার্থক হল এতদিনে। তার ৩।৪ দিন পর স-সহচর ত্রিভঙ্গ দাস ফিরে গেলেন; আর ঠাকুর মশায়ের সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হল গদাধর দাস বাবাজীর কাছে। সমগ্র হোরি ও ঝুলন পালাসহ বিভিন্ন লীলার অজানা ও অপ্রচলিত সব গান তিনি আয়ত্ত করে নিলেন গদাধর দাসের কাছে। ত্রিভঙ্গ দাস ছিলেন ভাবের গায়ক, আর মধুকণ্ঠ গদাধর দাস ছিলেন সুরের গায়ক। সেই ভাব ও সুর একাত্ম হল ঠাকুর মশায়ের গানে।

এইবার তাঁর লক্ষ্য পড়ল সূচক (শোচক?) ও চৈতন্যমঙ্গল গানের

প্রতি। রাখালানন্দ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় তিনি সমগ্র গৌর পরিকর ও মহাজনগণের সূচক গান সংগ্রহ করে তাতে এমন ভাব-গম্ভীর মধুর সুর ও আঁখর সংযোজিত করেন যে সূচকের অন্তঃস্বরূপ সেই সঙ্গীতে হয়ে ওঠে মূর্ত্ত।

এরপরই আসেন ৺কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী। তিনি প্রধানতঃ মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন, কিছু কিছু গানও জানতেন। ঠাকুর মশায় তাঁর কাছ হতে কতকগুলি গান সংগ্রহ করেন. তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ভনিতাহীন সুন্দর সুন্দর বৃন্দাবনী টুকগান ছিল।

৺বিশ্বম্ভরদাস বাবাজীর কাছে ঠাকুর মশায় প্রাথমিক চৈতন্য মঙ্গলের পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর বড়ডাঙা উৎসবে আগত প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক ৺অবধূত দাসের কাছেও কিছু কিছু গান শিক্ষা করেন। সবশেষে আসেন বৃন্দাবনবাসী অদ্বিতীয় চৈতন্যমঙ্গল গায়ক ৺চাঁপা ঠাকুর। তিনি এখানে ৪।৫ দিন মাত্র অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় মধ্যে যতগুলি সম্ভব গান শিখে নেন পরে নিজেই সেগুলিকে পালাবদ্ধ করেন।

জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তাঁর শিক্ষার আগ্রহ ছিল প্রবল তাই তাঁরই ছাত্র হরিদাস কর কর্ত্তৃক বৃন্দাবন থেকে আনা ২খানি গান, অন্যতম ছাত্র কমল দাসের কাছে ২খানি গান, অন্য এক ছাত্র মুরারি বাবাজীর কাছে ১খানি গান ও অন্যতম ছাত্র নাগা নিত্যানন্দের কাছে ১খানি গান শিক্ষা করেছিলেন শেষ বয়সে। তাছাড়া মূলগায়ক ৺গোপাল দাস কয়েকখানি গান শিখতে কিছুদিন ঠাকুর মশায়ের গৃহে অবস্থান করেছিলেন; সেই সময় কতকগুলি অপ্রচলিত তালের গান তিনিও শিখে নেন উক্ত মূল গায়কের কাছে। তিনি বলতেন শিক্ষার শেষ নেই। তাই শিক্ষা গ্রহণ-ক্ষেত্রে তাঁর কোন ছোটবড় বাছবিচার ছিল না। আরো বলতেন "শিক্ষা বাড়ে দানে, ব্যবসা বাড়ায় ধনে"। তাইত তিনি পেরে-

ছিলেন মধুমতীর ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে রাখতে কীর্ত্তনরস সুধা দিয়ে ভবিষ্যৎ মধুপিপাসুদের জন্য। এইরূপ ব্রজ ও বঙ্গভূমির সমস্ত কীর্ত্তন তারকা একটী মাত্র অবয়বে লীন হয়ে সৃষ্টি করল এক সংকীর্ত্তন মহাসূর্য্য, যা কখন হয়নি, হবার নয়।

সংকীর্ত্তনের প্রসার ও অনুশীলনের জন্য তিনি সমবয়স্ক ও প্রায় সমবয়স্কদের ভালভাবে তালিম দিয়ে তাঁদের নিয়ে একটী কীর্ত্তন পরিমণ্ডল গঠন করলেন; আর পদও আখর শুদ্ধিকরণের ভার তাঁর খুল্লতাত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বিশেষতঃ বৈষ্ণব দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মশায়ের উপর। গৌরগুণানন্দ নিজে পণ্ডিত হলেও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। এমনকি তাঁরই রচিত বহু সুন্দর ও মধুর আখর সংযোজিত হয়েছে গৌরগুণানন্দের বহুগানে যার দ্বারা গানগুলি হয়েছে অধিকতর ভাবব্যঞ্জক ও রসোত্তীর্ণ। গৌরগুণানন্দের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে শাস্ত্রী মশায়ের দান অপরিসীম। অনুশীলন কার্য্যে বন্ধুবর ৺সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজও তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন। কারণ সঙ্গীত ও বাদ্য উভয় বিষয়েই তাঁর উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল।

নাম সংকীর্ত্তনেও ঠাকুর মশায়ের অসাধারণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। আখরের পর আখরে তিনি যখন ভাবাবেগে কীর্ত্তন করতেন তখন শ্রোতার হৃদয়ে রসটী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠত। পূজ্যপাদ ৺রামদাস বাবাজী মহারাজ ছাড়া এরূপ নাম সংকীর্ত্তন শোনার সৌভাগ্য এ অধমের ভাগ্যে আর কোথাও ঘটেনি।

মনে হয় ঠাকুর মশায়ের উপর ঈশ্বরের করুণা ছিল অপরিসীম। কারণ তাঁর বিশেষ কয়েকটী ঐশী শক্তি ছিল। নিত্যলীলাসহ রাধাকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা যার প্রত্যেক লীলার একাধিক গৌরচন্দ্র, যাবতীয় সূচক, নাম সংকীর্ত্তন ও যাবতীয় গৌর বিষয়ক পদ,

চৈতন্যমঙ্গল ও পয়ার, অধিবাস, হরিবাসর, দধি-হরিদ্রা, নগর কীর্ত্তন, নাগরী মিলন, বড়ডাঙা পর্য্যায়, প্রভাতী, শীতলারতি, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, গুরু বন্দনা, দেহতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, নাম মাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের পদ ও তার হাজার হাজার আখর কোন্ শক্তিবলে তিনি স্মরণে রাখতেন? শুধু তাই নয় বিনা যন্ত্রে তাল ও সুর সহ সেগুলিকে শুধু কণ্ঠে ধরে রাখা কি ঐশী শক্তি নয়? আর একশক্তি, তিনি একদিনে ৯।১০ ঘণ্টা গান করতে পারতেন অনায়াসে। যাঁরা গোষ্ঠ গান কিংবা ঠাকুর নরহরির তিরোভাব উৎসবে ঠাকুর মশায়ের গান শুনেছেন তাঁরাই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিন চার দিন এরূপ পরিশ্রম করেও তাঁকে কখনও ক্লান্ত বা অসুস্থ হতে দেখিনি।

সাড়ে ছ ফুট লম্বা, পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতির, সৌম্য ভাবগম্ভীর চেহারা ছিল এই মানুষটীর। গলাও ছিল তদুচিত দরাজ অথচ মধুর। চড়া ও খাদে সমান স্পষ্ট। বাণী ছিল শ্রুতি সুখকর। শুধু তাই নয়, রাত্রিকালে আধ মাইল দূর হতে তাঁর গলা শোনা যেত।

এখনকার মত তাঁর গানে কোন বক্তৃতার বালাই ছিল না। একটী ছোট পালাতেও তাঁকে অন্ততঃ ১৪।১৫ খানি গান পরিবেশন করতে হত। সুমধুর ও সরস আখরে আখরে মূর্ত্ত করে তুলতেন লীলার স্বরূপকে। প্রসঙ্গের পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য দোঁহার সুরে আবৃত্তি করতেন ২।১ পদ। গানে আবিষ্ট হয়ে কোন্ ভাবরাজ্যে তিনি চলে যেতেন একমাত্র তিনি ও তাঁর অন্তর্যামী তা বলতে পারেন।

আজকাল পাঠকের স্থান পরিগ্রহ করেছেন কিছু মূল গায়ক। গৌরচন্দ্রসহ ৫।৬ খানি পদ গান করে বাকীটা বক্তৃতার দ্বারা বুঝিয়ে গায়ক লীলাটী জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বড় তাদের

গান কদাচিৎ শোনা যায়। দোঁহার সঙ্গে এবং ঢপ কীর্ত্তনের সঙ্গে ছোট আখর ও ছুটকী বাজনায় বাজীমাৎ করার প্রয়াশই বেশী চোখে পড়ে। প্রথম থেকেই নায়ক নায়িকার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এবং নানা বিপরীত রসের অবতারণা করে শ্রোতার বাহবা আহরণের প্রচেষ্টাই বেশী। নিজ নিজ পরিবেশিত গানের ব্যাখ্যায় ও নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হতে নানা শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে লীলাকে এক জগাখিচুরীতে পরিণত করেন। এই গান শুনে জনৈক সুপণ্ডিত ভক্তকে ঠাট্টা করে বলতে শুনেছি--

"পরমান্নে টক নুন ঝাল, তেঁতোর সঙ্গে ঘি।
পঞ্চরস একসঙ্গে খেলে, দোষটা হবে কি ?"

কি দোষ হবে জানিনা। তবে পয়সা খরচ করে দল এনেছি; তাই ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে এবং 'ক্ষীরং নীরমধ্যাৎ' করতে হবে। প্রগতির যুগে সুসভ্য গায়করা'ত আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। পদের উপর লিখিত রাগের নাম দেখে তাঁরাত প্রচলিত গানকে অশুদ্ধ ঘোষণা করে তাতে নোতুন ভাবে সুর দিয়ে বঙ্গের এই সুপ্রাচীন কৃষ্টিকে গতিশীল করার জন্যে পথে নামিয়েছেন আর তাকে ঠেলা দিয়ে চালু করার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে সরকারী রকেট "আকাশবাণী"। এই জন্যই গ্রাম বাংলার কোন কীর্ত্তনীয়ার গান শোনা যায় না উক্ত আকাশবাণীতে।

ঠাকুর মশায় ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীকে বিভক্ত করে কোন সময় কি গান গাওয়া উচিত তাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কীর্ত্তনকে তিনি কোন বিশেষ রাগাশ্রিত বলে মনে করতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি অনেক মার্গ-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের সহিত, আলোচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মার্গ-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ স্বনামধন্য ৺রাধিকামোহন গোস্বামী এবং তদীয়

সুযোগ্য ছাত্র ৺যতীন্দ্রনাথ বাগচীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধিকাবাবু ও পণ্ডিত বাবাজীর মধ্যে আলোচনা সভা হয়েছিল দানবীর মহারাজা ৺মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর দরবারে; আর যতীন্দ্র বাবুর সঙ্গে ঠাকুর মশায়ের আলোচনা হয়েছিল ঠাকুর মশায়ের বৈঠকখানায়। তর্ক বিতর্ক শেষে সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে মার্গ সঙ্গীতের ন্যায় কীর্ত্তন সুর-প্রধান নয়, বরং বাণী ও ভাব প্রধান। তাই সুষ্ঠুভাবে লীলা পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনমত সুর প্রয়াগ করা হয়েছে। এ এক অন্য ধারা যার বুদ্ধিতে বা আইনে ব্যাখ্যা চলে না; চলে সভক্তি একনিষ্ঠতায়। উক্ত যতীন বাগচী কিছুকাল ঠাকুর মশায়ের কাছে কীর্ত্তন শিক্ষা করেছিলেন।

ঠাকুর মশায় যে যে তালে গান করতেন তার একটী তালিকা নিম্নে উল্লেখ করছি; যথা—লোফা, ছোট ও বড় ডাশ পাহিরা, ছোট ও বড় একতালি, ছোট ও বড় দোঠুকী, বড় ও কাটা তেওট, ১৬, ২৪, ৩২ চাপড়ের ধরা, দোজ, ইন্দ্রভাষ, গজল, মদনদোলা, বিষম পঞ্চম তাল, ষট্‌পদী, দুর্গা, ছোট ও বড় রূপক, আড়তাল (বড়), ছোট, বড়, মধ্যম ও কাটা দশকুশী, ছোট ও বড় বীর বিক্রম, শশীশেখর, সোম, 'জাতসোম' বড় একতাল (১৬ মাত্রা), তেওড়া, ঝাঁপতাল, ঝুমরা প্রভৃতি।

গড়েরহাটী (ধ্রুপদ জাতীয়), মনোহরসাহী (খেয়াল জাতীয়) ও রেনেটী (ঠুংরী জাতীয়) এই তিন প্রকার গানেই তিনি ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ। প্রথমে গড়েরহাটী, মধ্যে মনোহর সাহী, শেষে রেনেটী ও ঝুমরা দিয়ে উপসংহার—এই ছিল সাধারণতঃ তাঁর লীলা কীর্ত্তনের ঢং। ঝাড়খণ্ডী ও মান্দারণী কীর্ত্তন এখন অপ্রচলিত বা রেনেটীর সহিত মিশ্রিত।

ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে যাঁরা স্থায়ীভাবে মৃদঙ্গে সঙ্গত করতেন

তাঁদের নাম যথাক্রমে ঃ—( ১ ) ৺সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজ ( ২ ) ৺অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ( ঠিবা ) ও শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর। ১নং ও ২নং এর প্রাপ্তির পর শ্রীযশোদানন্দের সহযোগিতা করেন ৺সুবলচন্দ্র মল্লিক ও ৺রামদাস ( পাঁচথুবী )। উক্ত দুই জনের মৃত্যুর পর শ্রীযশোদানন্দের সহ-বাদকরূপে আসেন শ্রীব্রজরাখাল দাস ( উক্ত রামদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মৃদঙ্গে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ) এবং ৺মুরারী বাবাজী।

যাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঙ্গে সাময়িকভাবে মৃদঙ্গে সহ-যোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) ৺নবদ্বীপ ব্রজবাসী ( কলিকাতা, ইনি পণ্ডিত বাবাজীর বাদক ছিলেন এবং সুগায়কও ছিলেন ) (২) শ্রীপরেশ চন্দ্র মজুমদার ( কলিকাতা ) (৩) ৺বিধু বাবু ( কলিকাতা ) (৪) ৺কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী ( নবদ্বীপ ) (৫) ৺যতীন বাবু ( নবদ্বীপ ) (৬) ৺জ্ঞানানন্দ ঠাকুর ও (৭) শ্রীনদীয়ানন্দ ঠাকুর ( দক্ষিণ খণ্ড ) (৮) ৺গোপাল দাস (ঠিবা) (৯) ৺ভুজঙ্গ দাস (বড়োয়া) (১০) ৺মাখন দাস ( মুর্শিঃ ) (১১) ৺মদন বৈরাগ্য ( বুঁইচি )।

তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা স্থান হতে নিমন্ত্রণ আগে কীর্ত্তন পরিবেশনের জন্য। তখন "ফুটিল কুসুমবন, মাতিল ভ্রমরাগণ, ছুটিল কীর্ত্তন সুধা আগে।" তিনিও তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার উজার করে বিলিয়ে দিতে চাইলেন বিনামূল্যে, এমনকি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে। যে সমস্ত তারকা সেই সূর্য্য থেকে কম বেশী আলোক নিয়ে আলো বিতরণ করেছেন বা এখনও করছেন তাঁদের নামের পাশে × চিহ্ন দেওয়া হল। নিম্নে তাঁর ছাত্রগণের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।

(১) খণ্ডবাসী ৺পঞ্চানন ঠাকুর, ৺দ্বারিকানন্দ ঠাকুর, ৺সুরেন্দ্র কিশোর কবিরাজ (×), ৺সুধাংশু শেখর রায়, ৺শচীবিনোদ-

ঠাকুর, ৺লোচনানন্দ ঠাকুর, ৺মন্মথ শেখর রায়, ৺অমিয়ানন্দ ঠাকুর (×) শ্রীমথুরাবিলাস ঠাকুর, শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর, শ্রীগৌর-গোপাল ঠাকুর, শ্রীবলরাম বিলাস ঠাকুর, শ্রীসীতানন্দ ঠাকুর (×) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর রায় (×), শ্রীপ্রকাশানন্দ ঠাকুর (×), শ্রীসলিলানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি।

(২) এখানে বাস করে ভিন্নগ্রামী—৺শচীনন্দন দাস, স্বর্ণহাটী (×), ৺কমল দাস ঐ পুত্র (×), ৺গোপাল দাস, মুস্থলী (×), ৺শ্রীপতি বাবাজী (×), ৺রামপদ রায়, পিণ্ডিরা, ৺নিত্যানন্দ দাসবাবাজী, পুরী, ৺মুরারী বাবাজী পাঁচথুবী, ৺যতীন্দ্রনাথ বাগচী প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক, রামচন্দ্রপুর, শ্রীনাগানিত্যানন্দ দাসবাবাজী, বৃন্দাবন (×), শ্রীমান হরিসাধন, পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীমৎ রাধাচরণ দাস-বাবাজী, নবদ্বীপ (×), ৪জন মনিপুরী নামধাম জানা নেই, ৺অন্ধশিবু দাস, শক্তিপুর (×), শ্রীহরিদাস কর (×) ফরিদপুর অধুনা নবদ্বীপবাসী, শ্রীরাধারমণ কর্ম্মকার, নবদ্বীপ (×), ৺কালো-বরণ দাস, সাঁড়ী (×)।

(৩) যাঁরা নিজগৃহ হতে এসে শিখেছেন :—৺ধ্রুব দাস, আলমপুর (×), শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ঐ পুত্র (×), ৺পূর্ণ চাঁই, গাঁফুলিয়া (×), শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, গুশুম্বা (×) অধুনা কলিকাতাবাসী, ৺সুরেন্দ্র-নাথ আচার্য্য, কলিকাতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর, কবিরাজ ৺অমিয়ানন্দ ঠাকুর সরস্বতী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তীর্থ ও শ্রীসীতানন্দ ঠাকুর এই তিনজন ঠাকুর মশায়ের পুত্র। শ্রীপ্রকাশানন্দ ঠাকুর ও শ্রীসলিলানন্দ ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত ৺অমিয়া-নন্দের পুত্র ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর (চৈতন্যমঙ্গল গায়ক) ঠাকুর মশায়ের জামাতা উপরোক্ত ৺মন্মথ শেখর রায়ের পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীযশোদানন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মধুর সঙ্গতকার হিসাবে বর্ত্তমান। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঠাকুর মশায়ের মত স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও

সর্ব্ব জাতীয় কীর্ত্তন বিশেষজ্ঞ হয়েও বিধাতার নির্ব্বন্ধে ঠাকুর মশায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরই উক্ত অমিয়ানন্দ (মধ্যম) অকালে পরলোক গমন করেন।

সবশেষে আরাধনার ধন গৌরপদ হৃদে ধরে ও গৌরগুণগানে সদামত্ত সেই গৌরগুণানন্দের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"নরহরির প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে।"

# শ্রীখণ্ড ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর

(ডক্টর জয়গুরু গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী।
অধ্যাপক—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ)

"শ্রীখণ্ড ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর"—একটি সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ও সুপরিচিত ঐতিহাসিক নাম। এই নামের সঙ্গে জড়িত আছে 'স্মৃতি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' এক বিরাট ও সুমহান গৌরবময় ঐতিহ্য—যাহা হাজার পরিবর্তনের মধ্যেও সমানভাবে চলিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার যে

শক্তি তাহা প্রতিভারই ইন্দ্রজাল। শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের সেই আকর্ষণীয় প্রতিভা ছিল—যাহার স্পর্শে শ্রান্ত-ক্লান্ত-রিক্ত মানুষ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত, অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত গৌরকথা গানে, কাব্য লিখিত স্বাদু স্বাদু পদে, ছন্দে ও অলঙ্কারে এবং নৃত্য করিত প্রেমানন্দে। তাই শ্রীখণ্ডকে জানিতে হইলে গৌর-গুণানন্দ ঠাকুরকে আগে বুঝিতে হইবে; হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে তাঁহার সাধনলব্ধ গ্রন্থের বাণীকে। এই বাণীই সনাতন ধর্মী ভারতবর্ষের মর্মবাণী। ভারতের যে সাধনা দূরকে নিকটে করে এবং পরকে আপন করিয়া তোলে—শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের ছিল সেই সাধনা—স্বপ্নময় জীবনের চেয়ে জীবনময় সাধনা। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; তাঁহারাই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আর পারিবেন শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবদের প্রদর্শিত ও নির্দেশিত মহাজন পদাবলীর অমূল্য রসতত্ত্বের কথা, নরহরি সরকার ঠাকুরের সাধন ভজনের কথা; লোচনদাসের ধামালী ও চৈতন্যমঙ্গলের কথা এবং গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দের কথা। পোষাকী ধর্ম লইয়া বাঙ্গালী কোনদিন তৃপ্তি পায় নাই, মন্দিরে ঠাকুর যতদিন না অন্তরের ঠাকুর হইতে পারিয়াছে ততদিন তাহারা পূজা করিয়া তৃপ্তি পায় নাই। তাই শ্রীখণ্ডের ভক্তেরা—

"ঘরের ছেলের চোখে দেখেছে বিশ্বভূপের ছায়া।
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া॥"

—বাঙ্গালীর হৃদয়রূপ অমৃত মন্থন করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভূত নির্য্যাস—শ্রীচৈতন্যদেব। পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল, তেমনি শ্রীখণ্ডে তিনভাগ 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু' গৌরসুন্দরের কথা; আর এক ভাগ 'ঠাকুর পরি-

বারের কথা ; সেখানে 'হলুদ বাটিতে হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ে যায় মনে।' ফলে 'শ্রীখণ্ড ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর' যেন ছায়া ও কায়া, একই দেহে দুইরূপ—'রসরাজ মহাভাব, দুই একরূপ।'

মূলতঃ বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব তীর্থ কেন্দ্রের মধ্যে "শ্রীখণ্ডের" নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভারততীর্থের এক তীর্থ, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মিলনভূমি, মহাপ্রভুর লীলাভূমি এবং বৈষ্ণবদের মন-বৃন্দাবন, প্রেম-বৃন্দাবন ও নিত্য-বৃন্দাবনের নিত্য-রাসস্থলী। কারণ—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শুধু শ্রীখণ্ড নয়—শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। ইহা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট। আর গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের কৈশোরের লীলা-ভূমি, যৌবনের সাধনভূমি এবং বার্ধক্যের বারাণসী—

"মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব।
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব॥"

সত্যই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালী হৃদয়ের রাজধানী যেখানে গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, 'জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি।' তৃষিত জগৎ যে পথ খুঁজিতেছে, সেই পথের জাগ্রত পথিক—গৌরভক্ত, বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ও তাঁহার গৌরমাখা পরিবার—'যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।'

প্রাচীনকালে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড "বৈদ্যখণ্ড" নামে অভিহিত হইত। বৈদ্যখণ্ডে তখন বসতি ছিল বহু শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত বৈদ্যদের। যেমন—শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন, দামোদর সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন, জগদানন্দ প্রভৃতি শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব। এই

সব বৈষ্ণব মহাজনদের প্রদর্শিত পথে সাধনা করিয়া গৌরগুণানন্দ ঠাকুর লাভ করিয়াছিলেন তিনটি বিদ্যা—প্রেম, ভক্তি ও সেবা। ফলে শ্রীখণ্ডে—

"অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রশীবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।

ভারতের পুণ্যভূমি গৌড়দেশে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টক নগরের (বর্তমানে কাটোয়া) সন্নিকটে শ্রীভাগীরথীর যোজনার্ধ পশ্চিমে শ্রীখণ্ডগ্রাম অবস্থিত। কাটোয়া হইতে রিক্সায়, বাসে বা ছোট রেলে এখানে আসা যায়। ১৫৯৭ শকাব্দে লিখিত মহা-মহোপাধ্যায ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভায়" আছে—

"শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে॥
যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যঃ খণ্ডোঽভূদ ভিষকপ্রিয়ঃ।
বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্ব্বেষামেব বাসভূঃ॥"

এই "বৈদ্যখণ্ডে" তথা শ্রীখণ্ডের বহু ব্যক্তি গৌড়ের রাজ-দরবারে চাকরী করিতেন। সেই সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শ্রীখণ্ড সাহিত্য চর্চার, বিশেষ করিয়া পদাবলীর অনুশীলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরি স্বয়ং, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন শাহার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ খাস চিকিৎসক—মুকুন্দ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের বিশেষ করিয়া নরহরি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব-দিগের একটি প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এখানে বহু দর্শনীয় জিনিষ আছে, যথা—মধুপুষ্করিণী, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গৃহ ও আসন, বড়ডাঙ্গায় ভজনস্থলী, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া, শ্যামরায়, মদন গোপাল, গ্রাম্যদেবতা—ভূতনাথ মহাদেব ইত্যাদি দর্শনীয়। এইসব দেখিলে মনে হয় স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে

এই ধূলার ধরণীতে এবং—

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়।
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়॥"

বস্তুতঃ শ্রীখণ্ডের পুণ্যভূমি হইতেই বাংলার বসন্ত-প্রভাতে কোকিলের প্রথম কাকলীধ্বনি উত্থিত হয় এবং বাংলার কুঞ্জে কুঞ্জে পিককণ্ঠ কবিকুলের ছন্দোবন্ধে ঝঙ্কার উঠে। গৌরগীতিরসের অমৃতস্পর্শ দিয়া বাংলার প্রাণশক্তিতে আত্মরসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—প্রেমের নাগরী নরহরি সরকার ঠাকুর। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বহু সুধী, জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন। তাই কবি গোপালদাস "নরহরি শাখা নির্ণয়ে" বলিয়াছেন—

"ক্ষিতি নরখণ্ড মাঝে খণ্ড মহাস্থান।
সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান॥"

আজও শ্রীখণ্ডের এই "সৌরভ" অক্ষুণ্ণ থাকার মূলে রহিয়াছে গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের এবং 'ঠাকুর পরিবারে'র প্রাণভরা প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা। আর সেবা-ধর্মে-দানে-ত্যাগে-মহত্ত্বে শ্রীখণ্ড আজও 'দ্বিতীয় বৃন্দাবনে'র খ্যাতি বহন করিয়া চলিয়াছে। এখানে আসিলে মনে হয় সবকিছু হারাইয়াও অনেক কিছু পাইয়াছি এবং 'জীবন শুধু সুন্দর এই জন্যই তার অনেকটা মাধুর্য্য দিয়া ঘেরা। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই আঁট হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন এবং প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছু কালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। "শ্রীখণ্ড" সেই মিলনের স্থান, সেই খেলাগৃহ, মানব হৃদয়ের ধ্রুব অসীমের বিকাশ। তাই—

"একের চরণে রাখিলাম,
বিচিত্রের মর্মবাণী—
এই মোর রহিল প্রণাম।"

মূলতঃ শ্রীখণ্ডের 'ঠাকুর পরিবার' ব্যক্তিগত পরিবার নয়। এই পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—শ্রীখণ্ডের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মহিমা-ঐতিহ্য। "ঠাকুর পরিবার" অর্থই "গৌর-পরিবার"—যেখানে 'অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।' এই পরিবারের অতিথি—গৌরের অতিথি। তাই দেখিলাম, আমাদের সেবা হইবার পর সমস্ত পরিবার প্রসাদ পাইলেন্। গৌরের অতিথি আমরা। তাই অতিথি সেবায় আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল 'গ্রহণ করেছে যত ঋণী তত করেছ আমায়।' গৌরের সংসার—ফলে, গৌরের নামে ধর্মগোলা, গৌরের নামে রন্ধনশালা, অতিথিশালা, গৌরের নামে মন্দির, গৌরের নামে জলাশয়, গৌরের নামে রাস্তা, গৌরের নামে পাঠশালা, গৌরের নামে শপথ অর্থাৎ 'দিব্যি' পর্য্যন্ত চলে। তাই শ্রীখণ্ডের ভাবধারার মূল কথা—"নারী বই মানুষ নাই, গৌর ছাড়া পুরুষ নাই।" ইহা আরও ভাল-ভাবে বুঝিলাম শ্রীল গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর সময়। দেখিলাম এক ধ্যানমগ্ন ঋষি বই-এর অরণ্য হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন—চারিদিকে—শুধু গ্রন্থরাজি, ডানে-বামে-পশ্চাতে শুধু গ্রন্থ আর গ্রন্থ। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়া ফেলিলাম; মনে হইল সাক্ষাৎ গৌর দর্শন হইল। যিনি সর্বদাই গৌরগুণানন্দে মত্ত, রোগে-শোকে-জরা-ব্যাধিতে তাঁহার কি ক্ষতি করিতে পারে? কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—'গৌর বড় না কৃষ্ণ বড়?' এই প্রশ্ন এত কঠিন যে এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মনে মনে গৌরকে স্মরণ করিলাম এবং দেখিলাম যিনি রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ, যিনি অপ্রাকৃত জগতের প্রেম-মাধুর্য্যের চাবি কাঠির সন্ধান দিয়াছিলেন, যিনি 'রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা' জগতে জানাইয়াছিলেন এবং যিনি রাধা-কৃষ্ণের লীলা মহিমায় 'গৌরচন্দ্রিকা'য় প্রথমেই বন্দিত

হন—তিনিই বড়। আমার এই উত্তরে তিনি এত খুশী হন যে রোগের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন এবং প্রেমাশ্রুনেত্রে শ্রীনরোত্তম দাসের একটি পদের দুইটি ছত্র গাহিলেন—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।"

যিনি প্রেমধনে ধনী, যাঁহার অন্তরে সর্বদাই গৌর-বিরাজ করেন; তাঁহাকে দেখিলেই তীর্থ দর্শনের ফল হয়। আজ তাঁহাকে হারাইয়া কেবলই মনে পড়িতেছে—

"এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর।
তোমারেও ভালো বাসিবারে, আজ তাই কাঁদে অন্তর।"

মানুষের চিরকালের কামনা—"I will not let thee go" —'যেতে নাহি দিব', 'তবু যেতে দিতে হয়; তবু চলে যায়', থাকে শুধু স্মৃতি—যাহা কাঁদায় এবং 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হইয়া বাঁচিয়া থাকে। "শ্রীখণ্ড ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর" তাই একটি অবিস্মরণীয় নাম, যাহা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'র মধ্যে সার্থকতা লাভ করিবে। শহরের জীবনে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান—সেখানে এই পৃথিবীর এক প্রান্তে একটা 'সব পেয়েছি জগৎ' আছে—এখানে দুঃখ-দারিদ্র-দৈন্য-শোক সবই আছে; কিন্তু তাহাদের সব কিছুকে ছাপাইয়া এমন একটা মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে যার আশ্রয়ে এখনও নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হইয়া থাকা যাইতে পারে। তাই বলি—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা॥
সই লো! কহ না গৌরকথা॥"

—::●::—

## সঙ্কীর্ত্তনাচার্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস (কীর্ত্তনীয়া)

গৌরগুণানন্দ একজন শুদ্ধ কীর্ত্তনানুরাগী ছিলেন। বাংলার নিজস্ব সম্পদ যে কীর্ত্তন, এই কীর্ত্তন রসের খনি, কিংবা বারিধি বলিলেও অধিক বলা হয় না। ৭২ বৎসর বয়সেও তিনি তাঁহার আজানুলম্বিত ভুজ-সঞ্চালন পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে ৬।৭ ঘণ্টা কীর্ত্তন করিতেও তিনি নিরলস। তিনি মনে প্রাণে কীর্ত্তনকে ভজন সাধন বলে মেনে নিয়েছিলেন। কীর্ত্তন রস-সমুদ্রে যখন তিনি ডুবে যেতেন বাহ্য স্মৃতি তাঁর থাকত না।

—::❋::—

# খণ্ডবাসী গৌরগুণানন্দ ঠাকুর

—জয় নিতাই দাস (মহান্ত)

শ্রীল সিদ্ধ বাবা শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় শ্রীপাট শ্রীখণ্ড শ্রীল নরহরির শ্রীপাটে আসিয়া প্রায় এক বৎসর ভজন সাধন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া কাটোয়ায় বাস করেন। এখানে ভজন করেন গঙ্গাধারে। শ্রীযুক্ত শ্রীল সিদ্ধ বাবার তিরোভাব তিথি ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদ আরাধনা করিতে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় প্রতি বৎসর আসিতেন, ভজন কুটিরে থাকিতেন, কীর্ত্তনাদি করিতেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আনন্দ দান করিতেন এবং আপনিও আনন্দ পাইতেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীল ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী মহারাজ থাকিতেন এবং তিনিও কীর্ত্তন করিতেন, তাঁর সঙ্গে শ্রীল রাধাচরণ দাস বাবাজী মহারাজও থাকিতেন এবং কীর্ত্তন করিতেন। হোলী কীর্ত্তন করিতেন এবং সিদ্ধ বাবার সূচক কীর্ত্তনও হইত। যাঁহারা সিদ্ধ বাবাকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তিনি ছিলেন গৌরগতপ্রাণ তা না হলে ব্রজ ছেড়ে আসবেন কেন?

—:❋:—

# পূজ্যপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

—রাখালানন্দ স্মৃতি সমিতি

জন্ম—৮ই শ্রাবণ, ১২৭৪ সাল

মৃত্যু—২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীপাট শ্রীখণ্ড গ্রামে ১২৭৪ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর (ব্রজলীলায় মধুমতী সখি) পরিবারে ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমন্ মুকুন্দানন্দ ঠাকুর প্রভুর পুত্র—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মানস পুত্র কন্দর্পাবতার শ্রীমৎ রঘুনন্দন ঠাকুর প্রভুর জগদ্বিখ্যাত বংশে প্রাতঃস্মরণীয় কেশবানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের ঔরসে ও সুনয়নী দেবীর গর্ভে রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় জন্মপরিগ্রহ করেন। বাল্যে তিনি বড়ই চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুমিষ্টকথা, মধুরআকৃতি, প্রখরবুদ্ধিমত্তা ও অকপটতায় সকলে বিরক্ত না হইয়া তাঁহাকে বরং প্রীতির চক্ষেই দেখিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পিতা ও পিতৃব্যের ইচ্ছানুসারে বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমে কৈশোরে পণ্ডিতকুলচূড়ামণি অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শণাদি অধ্যয়ন করেন। প্রতিভাবান্ যুবক অতি অল্প দিনের মধ্যেই সকল শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া গুরুদত্ত "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করতঃ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ

করিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর তিনি জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পণ্ডিত-কুলভূষণ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত বিবিধ শাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত করেন। এই সময় হঠাৎ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভীষ্ট ধাম গমন করায় তিনি অতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ "সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠী" স্থাপনা করেন। এই সময়ে শ্রীখণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ভদ্র-মহোদয়গণ মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কয়বৎসর যোগ্যতার সহিত তিনি এই কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার টোলে সব সময়েই বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ছাত্রমণ্ডলী পরিবৃত ব্যাসাসনে উপবিষ্ট অধ্যাপনারত তাঁহাকে দেখিয়া তপোবনের আচার্য্য ঋষিগণের কথা মনে পড়িত। তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী পড়ুয়াগণ তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। অধ্যাপনার সহিত তিনি গ্রন্থ রচনাতেও মনোনিবেশ করেন। হরিনামামৃতব্যাকরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অলঙ্কারকৌস্তুভ, হংসদূত, মাধব-মহোৎসব, ভক্তিচন্দ্রিকা পটল প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভট্টিকাব্যের হরিনামামৃতব্যাকরণ সম্মত ব্যাখ্যা, ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষানুবাদ এবং সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বহু কবিতা, পদাবলী, প্রবন্ধ ও নাটকাদি রচনা করেন। গৌড়রাজর্ষি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকুল্যে তাঁহার নরহরিকৃত ভক্তিচন্দ্রিক পটল গ্রন্থের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সুললিত টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সুললিত বাঙ্গালা নাটক "শ্রীখণ্ডোৎসব" শ্রীখণ্ড রঘুনন্দন নাট্যপরিষদ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। "বড়ডাঙ্গা উৎসব" সুশৃঙ্খলায় পরিচালনার জন্য নবডাকে

গঠিত মধুমতা সমিতির তিনি আজীবন অধ্যক্ষ ছিলেন; শ্রীখণ্ড 'গৌরগণহিতৈষিণী সভার' তিনি মূলস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে গৌরগণহিতৈষিণী সভার সমুদ্যোগে শ্রীধামনবদ্বীপে গৌরমন্ত্র বিচারসভার যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকল্পে শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী" নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার যে সমস্ত রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বঙ্গ সাহিত্যের একটি অনবদ্য সম্পদ।

তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের পাঠ যাঁহারা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিয়াছেন—তাঁহার বলিবার ভঙ্গী—সুন্দর ব্যাখ্যা—সরল ও মনোরম; সন্দেহ স্থলের মীমাংসা—অনবদ্য, মনোহারী, মধুর, অশ্রুতপূর্ব্ব।

জীবনের শেষদিকে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপেই সজ্জনমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি কলিকাতা মোহিনীমোহন রোড নিবাসী ভক্তশ্রেষ্ঠ এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ এবং ভক্ত সুধী ও সজ্জনবর্গের সহিত বৈষ্ণবদর্শণাদি আলোচনা করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংকীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর সংকীর্ত্তনাচার্য্য ভক্তিরত্নাকর মহাশয়ের কলিকাতার বিভিন্নস্থানে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া সংকীর্ত্তনপিপাসুগণের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করেন। মল্লিক মহাশয়ের গৃহে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ সমাপনকরতঃ কবিরাজ শ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর সরস্বতী মহাশয়ের গৃহে দশ দিন ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া শারীরিক অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করায় গত ২১।৬।৪৮ তারিখে তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর

ভাগবদ্ভূমণের সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধনার, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, বহু বৈষ্ণব সাধক, কবি, সাহিত্যিক, পাঠক ও গায়কের জন্মভূমি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম পার্ষদগণের লীলাভূমি শ্রীখণ্ডের কৌস্তুভমনি ঠাকুর মহাশয় আজ নেই। গত ২৬।৬।১৩৪৬ তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম স্মরণ করিতে করিতে পুত্র পৌত্র, ও আত্মীয়গণকে তিনি শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বাভীষ্ট সাধনোচিত নিত্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

তাঁহার তিরোধানে শুধু যে বঙ্গ ও বৃহত্তরবঙ্গের গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা নহে, বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরের সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ এবং ভারতের সুধীসমাজ এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করিবেন। যে মহনীয় চরিত্র মাধুর্য্য, যে উদার স্বাজাত্যবোধ, যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এক বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সাধনায় কেন্দ্রীভূত হইয়া এই দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালার শুধু বাঙ্গলার নহে বাঙ্গলার বাহিরেও এক বৃহত্তর জনসমষ্টিকে উজ্জীবিত রাখিয়াছিল, মনুষ্যত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত করিতেছিল, রসরাজ মহাভাব শ্রীগৌরসুন্দরের মধুরভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল— আজ সেই সাধনার আধার চিরতরে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র-তিনি বিরাট, আমরা নীচ-তিনি মহান্, আমরা বাঁকা-তিনি সরল, আমরা অবৈষ্ণব-তিনি পরম বৈষ্ণব, সুতরাং আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে সঠিক বুঝিতে পারিব কি না সন্দেহ। যদি পারিতাম তাহা হইলে আমাদের এ শোচনীয় অবস্থা হইবে কেন? যেভাবে তাঁহাকে আমরা চাহিয়াছিলাম সেই ভাবেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পাইয়া আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না—যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৈকতনু

ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা—নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর ভজনপথের একনিষ্ঠ সাধক আকৃতিমধুর, ব্যবহারমনোহর, অজাতশত্রু, ত্যাগী ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে আমরা যেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মহাপ্রভুর ভজনপথে অগ্রসর হইয়া মানবজীবন সার্থক করিতে পারি।

পরিশেষে সকলের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন—তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সদা-জাগরুক রাখিবার মানসে "রাখালানন্দ স্মৃতি মন্দির" নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আমরা যত্নবান হইয়াছি। পাঠাগার, প্রদর্শণী, সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ চতুষ্পাঠী, সংকীর্ত্তন চতুষ্পাঠী প্রভৃতি ইহার সহিত সংযুক্ত রহিবে। এরূপ স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। সর্ব্বসাধারণ, গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলী, দেশদেশান্তরে নানাকার্য্যে রত তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ—এই মহৎকার্য্যে তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি দেখাইয়া আমাদের ন্যায় অভাজনগণকে উৎসাহিত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র বৈষ্ণবচূড়ামণি রামদাস বাবাজী মহাশয়, ভগীরথপুরের বৈষ্ণবগণ ও অন্যান্য বহু ভক্ত এই মহাযজ্ঞে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আমরা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা—আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টা যেন জয়যুক্ত হয়।

## উদ্বোধন সঙ্গীত—

ওগো রাঢ়জনগণ স্মরণানন্দ বিভল রাখালানন্দ তুমি,
ছিলে রসঘন রসিকবন্ধু সরসি' নিখিল বাংলা ভূমি ॥
তব অন্তরদ্বার ছিল যে খোলা হ'লে ঘর ভোলা ওগো আপন ভোলা
ছিল গোপীসম মনমধুকর রাখালিয়া প্রেমকমল চুমি ॥
জ্ঞানের সায়রে গাহন করি, অমৃতবিলালে জীবন ভরি,
তবু শিশুসম অনাড়ম্বর হে নিরভিমানী তোমারে স্মরি ॥
আজি আঁখিজল পড়ে যে ঝরিয়া, জাগি রহ চির স্মরণ ভরিয়া,
ভকতি কোমল অন্তর তল-বৈষ্ণব-মণি তোমারে নমি ॥

## সমাপন সঙ্গীত—

লহ প্রণাম লহ প্রণাম
ধরার ধুলায় ফুটেছিলে যেন গন্ধ কুসুম অভিরাম ॥
দুঃখ শোকের নিকষ কালোয় উজল করেছো হাসির আলোয়।
ভয়ভাবনার কণ্টকতলে সুরভি ঢেলেছো অবিরাম ॥
আজি, সংশয়-ঘন-তিমির টুটি কার বাণী বল উঠিবে ফুটি।
কে কহিবে আর পিরীতি কথার মরম নিঙারি গৌরানাম ॥
মূক হয়ে গেল মুখর এ ভূমি, তবু আঁখিজলে এধুলারে চুমি।
হেথা ছিলে তুমি মরমিবন্ধু ওগো-বৈষ্ণব-জনপ্রাণারাম ॥

# রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী

—শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ (মথুরা)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বংশবিভূষণ পণ্ডিতপ্রবর রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়কে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্যলাভ ঘটে কৈশোরে, শ্রীবৃন্দাবনধামের গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের নাভিদেশ চক্রতীর্থে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার সময়ে। তখন তিনি মহান্ত সনাতন দাস জেঠাবাবাজী মহারাজের আশ্রমে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' পাঠও করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিবার ও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অনেক ভজনশীল বৈষ্ণবও আসন ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই ব্রজমণ্ডলে তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কৃশশরীর, সর্ব্বপ্রাণিহিতকর মধুর ব্যবহার ও সস্নেহ-স্মিতের দর্শন মাত্রেই সকলেই তাঁহার নিজজন হইয়া যাইতেন। গ্রন্থপাঠকালে তাঁহার সাবলীল উচ্চারণ ভঙ্গীতেই সন্ধি-সমাস প্রভৃতি স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ জনেরও অর্থবোধ জন্মাইত এবং যখন বিষয়গত সূক্ষ্ম-তাৎপর্যগুলি বিশ্লেষণ করিতেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত রীতিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম; প্রায় পাঠকদের পাঠে কোনও সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যাকালে একটু স্বকীয় গৌরব প্রকাশেরও সুর তাঁহার মধ্যে অনুরণিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের ঐ পাঠে তাঁহার বিনয়-মধুর স্বভাব ও সমশীল গৌরপ্রিয়ের গম্ভীর ঘনিষ্ঠতা যুগপৎ প্রতিফলিত হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তিনি যেন শ্রোতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই

কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। অথচ তাঁহার যুক্তির অকাট্যতা ও গভীর অনুসন্ধান প্রবণতা সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিত। তাঁহার অতিমৃদু সুযুক্তিপূর্ণ স্বল্প ভাষণ, বাগ্মীর "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" লক্ষণকে যেন উপহাস করিয়াই নূতন-ভাবে সুবাগ্মিতার পরিচয় বহন করিত। ঐরূপ একজন গভীর দরদী সুবাগ্মীর পাঠ শুনিয়াই সর্ব্বপ্রথম "বিদ্যা বিনয়েন শোভতে" এই বাক্যের আভ্যন্তরীণ বাস্তব আশয় বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

শাস্ত্রীমহাশয় কয়েকখানি ব্যাকরণের ছাত্রকে সমভাবে পড়াইতেন। বিভিন্ন ব্যাকরণের সংজ্ঞাদি পৃথক হওয়ায় নিরন্তর চর্চা না থাকিলে সেই সেই ব্যাকরণানুসারে সূত্রাদির উল্লেখে পদাদি সিদ্ধ করা অতি দুরূহ হইলেও যে কোনও ব্যাকরণের ছাত্রকে যে কোনও স্থান হইতে সুন্দররূপে পড়াইতে তাঁহার বাধা হইত না। এইরূপ কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন. কি ধর্মশাস্ত্র, কি বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতির যে কোনও গ্রন্থ তিনি সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রদের অতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করার জন্য আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা থাকিলেও অধ্যয়ন করার সাক্ষাৎ অবসর ঘটে তিনি যখন শেষ সময়ে রাণীর চড়ার বাড়ীতে এবং পোড়ামাতলার নিকটস্থ তমালতলার গলিতে বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে কষ্ট দিতে সত্যই মনে কষ্ট লাগিত, তথাপি ন্যায়ের পরীক্ষার জন্য পাঠ্য শেষ না হওয়ায় সে বৎসরটিতে অধ্যাপকের অগোচরে কাব্যের উপাধি পরীক্ষাটি দিবার সঙ্কল্প করি; কিন্তু যাঁহারা অলঙ্কারাদি পড়ান, তাঁহাদের কাহারও নিকটে মনঃপুত না হওয়ায় নিজেই পড়িতে লাগিলাম ও কিছুটা অংশ পড়ার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে নিরুপায় হইয়াই কষ্ট দিয়াছিলাম। তাঁহার এমনই বিদ্যানুরাগ যে সেই অবস্থায়ও আমাকে বিমুখ করিতেন না। অধ্যাপনায় কিন্তু অনেকে সবজান্তার

ভান করেন; শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু গ্রন্থের অতিরিক্ত প্রয়োজন, সঙ্গতি, প্রমাণাদিও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, এমন কি, কোনও হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধির আশঙ্কা হইলে তাহা উদ্ধার করিয়া বিষয়ের প্রামাণ্য সুস্থির করিতেন। অথচ কখনও তাঁহাকে অবাস্তব কথা বলিতে অথবা কোনও দুরূহ বিষয় এড়াইয়া যাইতেও দেখা যায় নাই; অথচ অনেক খ্যাতনামা ব্যুৎপন্ন মহামহোপাধ্যায়াদি পণ্ডিতকেও তাদৃশ আচরণ করিতে দেখা যায়। শিষ্যজনের উপর দুর্ব্যবহার করা নাকি উপাধ্যায়দের সহজাত, মহামনীষী নীতিশাস্ত্রপারঙ্গত 'মুদ্রারাক্ষস'কারের এই উক্তি সর্বত্রই প্রামাণিকরূপে উপলব্ধ হইলেও একমাত্র শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়ই তাঁহার বংশগৌরবে স্বীয় চরিত্রের দ্বারা উক্ত প্রামাণিক বচনেরও ব্যতিক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপনায় কোনও বিরক্তি, উত্তেজনা, অহঙ্কার, বহুভাষিতা, অাপষ্টতা, অপ্রতিভা প্রভৃতি দোষের লেশও লক্ষিত হয় নাই। তিনি অতি অযোগ্য নির্বোধ ছাত্রকেও বিমুখ করিতেন না। রঘুনাথ শিরোমণির বলিয়া প্রসিদ্ধ "উপাধ্যায়ং তমহং মন্যেযস্তু মূঢ়ান্ প্রবোধয়েৎ" উক্তি অথবা "বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং যত্রশ্রোতা নবুধ্যতে" এই প্রাচীন উক্তির যাথার্থ্য তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিলেই স্থূলধী ছাত্রেরাও অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইত। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির তিনি একটি মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। আজকাল কেহ কেহ কোনও কোনও শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রখ্যাত হইয়া গেলেও ভারতীয় প্রাচীন দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সমবেত ধারায় যে বৈদিক শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে এবং এই সকল শাস্ত্রগুলি রচনার জন্য যেন সকল আচার্য্য একত্র মিলিত হইয়াই এক একজন ভাষা, প্রমাণ, প্রমেয়, ছন্দ, অলঙ্কার, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই

ইঁহাদের সমবেত উপদেশই ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল। সুতরাং কোনও একটিকে পরিত্যাগ করিলেই ভারতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব শব্দবিদ্যাকার তাঁহার বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠ করিতে তদীয় বর্ণ প্রভৃতি অসর্বজ্ঞ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া দুর্জ্ঞেয় তাদৃশ তত্ত্বের নিখুঁত প্রমাণ পদার্থ তত্ত্বাদি গ্রহণ করিলেও প্রমাণ-পদার্থ তত্ত্বাদির বিস্তার করেন নাই। এইরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ 'অভ্যুপগম' সিদ্ধান্ত-ন্যায়ে পরস্পর সহযোগে ভারতীয় শিক্ষা ও তত্ত্বস্থ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়া ভারতীয়গণকে উহার উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন এবং এই মূল রহস্যেরই জ্ঞাতা ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়। তিনিই জানিতেন "যদ্বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"। এজন্যই তাঁহার কোনও শাস্ত্রই অজ্ঞাত ছিল না এবং কাহারও বিবেচনায় তাঁহার ভুল হইত না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে অসাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অলৌকিক ঘটনাটিকে এখানে ব্যক্ত না করিয়া পারি না। সুদীর্ঘকাল যাবত শাস্ত্রী মহাশয় 'হরিনামামৃত ব্যাকরণে'র উপাধি শ্রেণীর তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা করিতেন। উক্ত পত্রে কয়েকখানি নব্যন্যায়ের শব্দখণ্ডের গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট আছে; কিন্তু উহা ব্যাকরণ শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অতিদুরূহ বলিয়া এবং তাদৃশ নব্যন্যায়ে উৎপন্ন বৈয়াকরণ দুর্লভ বলিয়া এ সকল বিষয়ে ছাত্রেরা অংশবিশেষ প্রায় মুখস্থ করিয়াই কোনওরূপে কার্য নির্বাহ করে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহা জানিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রশ্নপত্রে একটি বিলক্ষণ কৌশল অবলম্বন করিতেন। সে বৎসরে উক্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়া বৃন্দাবনের শেঠের বাগীচায় অবস্থিত শ্রীরঙ্গজীর পাঠশালার প্রখ্যাত নৈয়ায়িক অমোলক রাম শাস্ত্রী এবং ব্যাকরণ সাহিত্যাচার্য সীতরাম শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী, মদনমোহন শাস্ত্রী প্রভৃতি

নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের নিকটে গিয়া ঐ শাস্ত্রগুলির অধ্যয়নে বিশেষরূপে দিবারাত্র পরিশ্রম করি। এই সময়ে আমাকে একান্তভাবে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেন আমার বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছাত্র শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্যাকরণতীর্থ। সেবার দুইটি পত্রের পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর করিয়াও শাস্ত্রী মহাশয়ের তৃতীয় পত্রটির জন্য সংশয়াকুলিত ছিলাম। পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া দেখি সকল প্রশ্নই আমার জ্ঞাত বিষয়েই আছে, কিন্তু আশ্চর্য যে, প্রশ্নের যাহা উত্তর তাহাই প্রশ্নকর্তা সুবিশ্লিষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ তাঁহার অভিপ্রেত উত্তরটি যে কি, তাহা আদৌ বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না। প্রায় প্রশ্নেরই এই অবস্থা হওয়ায় উহা পুনঃ পুনঃ পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইলাম না। এদিকে চারঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেড়ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এবং প্রশ্ন পড়িতে থাকায় কেন্দ্র সম্পাদক ডাঃ গৌরবাবু কাছে আসিয়া বলিলেন,'কি, প্রশ্ন কি খুবই কঠিন'? 'আমি বলিলাম, কিছুই বুঝিতেছি না। আমার উপরে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকায় একটু বিমর্ষ হইয়া উহাদের মধ্যে যাহা সহজ তাহা লইয়াই কিছুটা লিখিতে উপদেশ দিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া একটি প্রশ্নকে লইয়া গভীরভাবে প্রায় আধঘণ্টা, কি তিন কোয়ার্টার চিন্তা করার পর তাঁহার দ্রষ্টব্য ও বিশ্লিষ্ট বিষয়ের ভেদ বুঝিতে সক্ষম হইলাম। দেখিলাম, উত্তর অতিশয় সামান্য, দুই এক পংক্তি মাত্র। তখন তাহা লিখিবার চেষ্টা না করিয়া অপর একটি প্রশ্নকে লইয়া তাহার তাৎপর্যে মনোনিবেশ করাতে অনেক স্বল্প সময়েই তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং ক্রমশঃ অপরগুলিও আমার বোধগম্য হইল। তখন মনটা প্রসন্ন হইল ও পুনরায় সব বিষয়গুলি সঙ্গতিক্রমানুসারে চিন্তা করিয়া লইলাম। চাহিয়া দেখি ঘড়িতে প্রায় আড়াইটা, কিন্তু একটি অক্ষরও লিখিত

হয় নাই দেখিয়া সম্পাদক মহাশয়ও বেশ চিন্তিত। অতঃপর অত্যল্প সময়েই সমস্ত উত্তরগুলি বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিয়া পুনরায় প্রশ্ন ও উত্তর পড়িয়া সন্তুষ্টমনে খাতা সম্পাদক মহাশয়কে দিতে গেলে তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে আরও দেখার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং এখনও অনেক সময় আছে বলিয়া চেষ্টা করিতে বলিলেন। আমি তখন তাঁহাকে প্রথম বিভাগে পাস করিবার নিশ্চয়তা দিয়া অনেক সময় থাকিতেই চলিয়া গেলাম। রাস্তায় ঘনিষ্ঠ যাঁহারা মিলিত হইয়া পরীক্ষার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষক রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া তাঁহার নিকটে পড়িতেছিলাম। তাঁহারা আমার হেঁয়ালী না বুঝিয়া সংশয়গ্রস্ত হইলে তাঁহাদিগকে রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাদানের রীতির প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলাম 'বহু পণ্ডিতের নিকটেই পড়িয়াছি, কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন করিতে গিয়া প্রষ্টব্য বিষয়কে বুঝাইয়া ছাত্রকে গভীরভাবে বিষয়ে প্রবিষ্ট করার এমন কৌশল ও পাণ্ডিত্য আমি দেখি নাই। এই কথা বলিয়া হিতৈষী সকলের কাছে তাঁহার অসাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা সোল্লাসে ব্যক্ত করিয়াছিলাম।' তাঁহার সেই মনীষা ও পরচিত্তবৃত্তিতে প্রবেশ করার ক্ষমতায় তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ না বলিয়া পারিনা। কারণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন যে, "পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা। যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞ ইতীর্য্যতে॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা গুণ ব্যক্ত করিতে এবং তাহা মহদ্ ব্যক্তিত্বের অধিকারী জনেও সংসক্ত হয় ইহা ব্যক্ত করিতে, শ্লোকটি সর্ব্বজ্ঞের লক্ষণ হিসাবে উক্ত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রী মহাশয় দেশ ও কালের ব্যবধানযুক্ত পরচিত্তস্থ অজ্ঞতাও তিনি উপলব্ধি করিয়া তাহার

প্রতীকার উপায়ও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। নতুবা প্রশ্ন করিতে গিয়া গূঢ়ার্থকে ব্যক্ত করে, এমন কোনও পরীক্ষক হয়, ইহা দেখা যায় না। তাঁহার অমায়ায় বিদ্যাদানের করুণা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অগাধনিষ্ঠা এবং বুনো রামনাথের ন্যায় বিষয়নিস্পৃহ জীবনযাত্রা ও সহিষ্ণুতা আমার ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধিরও সামান্য সংস্রবে যতটুকু বোধের রেখাপাত ঘটিয়াছে তাহা এত দৃঢ় যে, জন্মান্তরেও তাহা ম্লান হইবে না। যেহেতু মনীষীরা বলেন "সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা, পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।"

এই প্রসঙ্গে তাঁহার অসীম গুণাবলী আমার হৃদয়কে পুনরুদ্ভাসিত করার জন্য অতি সুপণ্ডিত প্রখ্যাত শিক্ষকগণেরও মাননীয় বর্ষীয়ান্ শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে করযোড়ে হার্দিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

—oo*oo—

## পণ্ডিতপ্রবর রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় রচিত একটি শ্লোক

—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ

শ্রীখণ্ড নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় আমার পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ সম্বন্ধে বাড়ীর দ্বারে শিলান্যাসের জন্য যে সংস্কৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

যস্তর্কভূষণ তয়াথ মহামহোপা-
ধ্যায়াখ্যয়াতু বিদিতো নৃপদত্তয়াভূৎ।
বিদ্বদ্বরঃ শিবতনু র্নবতর্ক বিদ্যা
পারঙ্গতো জয়তি সোঽভিধয়াশুতোষঃ॥
তস্যায়মালয়ঃ সালে বসুতর্কভুজেন্দুমে।
যো জাতো যঃ প্রযাতশ্চ চন্দ্রাগ্নিবহ্নিচন্দ্রমে॥

এই শ্লোকটি পণ্ডিত মহাশয় যখন শ্রীবাস অঙ্গনে থাকিতেন সেই সময় খুব সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সালে রচনা করিয়াছিলেন।

# কবিরাজ ৺কিশোরী মোহন সেন

—নমিতা সেন

কবিরাজ কিশোরীমোহন যে চিকিৎসাধারার বাহক ছিলেন তার সূচনা পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্বে। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে গৌড়বঙ্গের যে সব গ্রাম সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্ররূপে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল কাটোয়ার সন্নিকটস্থ গ্রাম শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডের বাস মানুষের মানসিক চেতনায় যেমন শান্তির প্রলেপ দিয়েছিল দৈহিক জ্বালা যন্ত্রণায়ও তার প্রলেপ ছিল অতি স্নিগ্ধকর।

যে দুটি মহাপ্রাণকে কেন্দ্র করে শ্রীখণ্ডের বিকাশধারার

সূচনা—তাঁরা ছিলেন দুই ভাই—শুধু দুই ভাই নয়—দুই অন্তরঙ্গ ভাই; এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব প্রচারক ও কবি রূপেও সনাতন। এই দুই ভাইয়ের বড় ভাই ছিলেন মুকুন্দ দাস ঠাকুর এবং ছোট ভাই ছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। এঁরা জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। বৈষ্ণব ভক্তিরস ও সাহিত্যের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল ভগবান চৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকারকে কেন্দ্র করে। অপর-দিকে ভক্তি ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ধারাটির সূচনা হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাসকে কেন্দ্র করে। মুকুন্দ সরকার ছিলেন হুসেন শাহের গৃহ-চিকিৎসক। সেই ধারাটি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনও বিভিন্ন সূত্রে বহমান।

এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম ধারক ছিলেন কবিরাজ কিশোরী মোহন সেন। কিশোরী মোহন সেন ইং ১৩১১ সালে শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সুরু হয় তাঁর শিক্ষা জীবন। এই সময় তিনি যাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশজাত প্রেমানন্দ ঠাকুর। সংস্কৃত শিক্ষার পর তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে আয়ুর্ব্বেদ চর্চাকে গ্রহণ করেন। তাঁর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার গুরু ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বিশ্বম্ভর সেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গ নিবাসী ছিলেন—এই সূত্রে পূর্ববঙ্গ ও গৌড়বঙ্গের মধ্যে যে যোগসূত্রটি গড়ে ওঠে, তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ছিল। সেই সূত্রে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষালাভের জন্য কিশোরী মোহন পূর্ব্ববঙ্গের সেরপুরে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। সেরপুর থেকে ফিরে তিনি কবিরাজী শুরু করেন—নিজ গ্রাম শ্রীখণ্ডে।

কিশোরী মোহন অল্পকাল মধ্যেই চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ

খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর নাড়ী-জ্ঞান প্রবাদে পরিণত হয়। তিনি নাড়ী দ্বারা কেবলমাত্র রোগ নির্ণয় নয়—মৃত্যুর কালের একটা নিকট সময় সঠিকভাবে বলে দিতে পারতেন। কবিরাজ কিশোরী মোহন দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে খুব সফল সূচীকাভরন প্রয়োগ ক'রে বহুব্যাধি নির্মূল করতেন—এবং এই চিকিৎসা তাঁকে খ্যাতির শিখরে উন্নীত করেছিল। শুধু শ্রীখণ্ড নয়, কাটোয়ার সামগ্রিক অঞ্চলই ছিল তাঁর চিকিৎসার ক্ষেত্র।

কিশোরী মোহন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় এবং শেষ কথা হ'ল তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, তাই চিকিৎসাকে তিনি জীবসেবা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চিকিৎসার দর্শণীরূপে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না এবং ঔষধের দাম হিসাবে যার যেমন সামর্থ্য—সেই সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্য গ্রহণ করতেন। তিনি দরিদ্রের কাছে ছিলেন দেবতা বিশেষ। এই কারণে খ্যাতিমান কবিরাজ হলেও তিনি অর্থ সম্পদে বিশেষ খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি।

কিশোরী মোহনের চার পুত্র ও চার কন্যা। চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় হরিমোহন আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করলেও তাঁর অকাল মৃত্যু—সেই ধারাটিকে অব্যাহত রাখতে পারেনি। কনিষ্ঠ পুত্র রাধামোহন চিকিৎসার ধারাটিকে অব্যাহত রাখলেও চিকিৎসার রূপ পরিবর্তন হয়। রাধামোহন যুগের দাবীর প্রয়োজনে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এখনও তিনি শ্রীখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। পিতার সেবাব্রতের ধারাটিও তিনি অব্যাহত রেখেছেন। কন্যা নির্মলা সুন্দরীও ভক্তিপ্রাণা মহিলা। শিয়ারশোলের বিখ্যাত গোপীনাথ জীউয়ের সেবাইত; আজও উক্ত বিগ্রহের সেবা এবং দানের ধারাটিকে তিনি প্রবাহিত রেখেছেন।

———

# গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক

( সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জী )

—শৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

[ পিতা—গোবিন্দনারায়ণ মল্লিক। ইঁহাদের পরিবার সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কেতুগ্রাম হইতে আসিয়া শ্রীখণ্ডে বসতি স্থাপন করেন। ]

জন্ম ঃ—১৮৮২ খৃঃ, শ্রীখণ্ডে।

শিক্ষা ঃ—আনুমানিক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীখণ্ড বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষা পাস—বর্ধমান বিভাগে প্রথম স্থান লাভ ; সরকারি বৃত্তি লাভ মাসিক ৮৲ টাকা।

১৮৯৯ খৃঃ—কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনসটিট্যুশন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস—বৃত্তিলাভ ১৫৲ টাকা।

১৯০১ খৃঃ—মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষা পাস—মাসিক বৃত্তিলাভ ২০৲ টাকা।

১৯০৩ খৃঃ—প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাস—সংস্কৃত অনার্স-এ প্রথম স্থান—রাধাকান্ত স্বর্ণপদক লাভ।—আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য অধ্যয়ন ত্যাগ এবং মাথরুন হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ।

১৯০৭ খৃঃ—প্রাইভেট ছাত্ররূপে বি-এল পরীক্ষা পাস।

১৯১১ খৃঃ—প্রাইভেট ছাত্ররূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা পাস—( দ্বিতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান, প্রথম শ্রেণীতে কেহই ছিল না। )

১৯১৪ খৃঃ—প্রাইভেট ছাত্ররূপে দর্শন শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা

পাস—( দ্বিতীয় শ্রেণী। )

কর্মজীবন :—১৯০৪-১৯০৮ খৃঃ মাথরুন স্কুলে শিক্ষকতা।

১৯০৮-১৯১০ খৃঃ কাটোয়ায় ওকালতি করিবার চেষ্টা অপ্রীতিকর অনুভবে ঐ বৃত্তি ত্যাগ।

১৯১১ খৃঃ—১৯১২ খৃঃ কলিকাতায় বাস ও অধ্যয়ন।

১৯১৩ খৃঃ ও ১৯১৪ খৃঃ—দুই বৎসর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনা।

১৯১৫ খৃঃ—১৯৪০ খৃঃ—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা।

মৃত্যুঃ—২৫শে আগষ্ট, ১৯৪০ খৃঃ—কলিকাতায়।

অন্যান্য কৃতিত্ব : ১৯২০ খৃঃ কুমিল্লা শহরে 'নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সম্মেলন' সংগঠন ও পরিচালনা—উহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ প্রকার সম্মেলন অভূতপূর্ব্ব।

১৯১৫ সালে 'The Philosophy of Vaisnava Religion' নামক গ্রন্থ প্রকাশ—ইংরাজী ভাষায়—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত। অধুনা ঐ গ্রন্থ Out of print.

পরম বৈষ্ণব :—১৯১৬ খৃঃ—নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষালাভ। আমৃত্যু নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবন সমীপস্থ 'গিরি গোবর্দ্ধন' হইতে 'গোবর্দ্ধন শিলা' আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি তাঁহার পুত্রগণ উক্ত 'শ্রীগিরিধারী'-কে গৃহদেবতা-রূপে অর্চনা করিতেছেন। তাঁহার যুগে শ্রীখণ্ডের এই কৃতী সন্তান ছিলেন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্রে, এবং পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অন্যতম।

---

# ৺মণীন্দ্র চন্দ্র রায়

—শ্রীবলরাম গোস্বামী

জন্ম—১২৯১ সাল ১৭শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবারে শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা—১৯০৬ সালে বর্দ্ধমান কলেজ হইতে F. A পাশ করেন। বহরমপুরে P. L (ওকালতি) পড়েন।

কাঞ্চনতলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতে করিতে Private Candidate হিসাবে B. A ১৯১৪ সালে এবং পরে M. A পাশ করেন।

রাজনৈতিক জীবন—১৯২১ সালে সারা ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার চলে। এই জোয়ারে ইনিও ভাসলেন। কাঞ্চনতলা স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করে বহরমপুরে জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"যে শিক্ষায় জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়, যে শিক্ষা জাতির দাস হবার প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে তাকে স্বাধীনতার পথে চালিত করতে পারে এবং যার বলে জাতি, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-সমূহের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারে অধিকারী হয়ে নিজ স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, তাহাই জাতীয় শিক্ষা।'

শিক্ষার ধারা কেবলমাত্র পুঁথিগত নয়; হাতে কলমে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

গান্ধীজী ১৯২২ খৃঃ আন্দোলন স্থগিত রাখতে এবং গঠনমূলক কার্য্যে অংশ গ্রহণ করতে নির্দ্দেশ দেন। এতে দেশে অবসাদ আসে।

দেশবন্ধু জেল হতে মুক্তি পেয়ে 'কাউন্সিল প্রবেশ' আন্দোলন আরম্ভ করেন। মণীন্দ্র বাবুর জাতীয় শিক্ষার ভাবধারাকে স্বাগত জানান দেশবন্ধু, গান্ধীজি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, যাদবেন্দ্র

শাঁজা, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহা ণ শেষ পর্য্যন্ত বহরমপুরে জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয় চালান সম্ভব হল না।

১৯২৬ সালে কলকাতায় এসে যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়ে (National Counsil of education) প্রধান Librarian হিসাবে যোগদান করেন। কলকাতায় বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের আহ্বানে বৈদ্য শাস্ত্র পিঠের প্রচার বিভাগের এবং Hospi.. Superintendent এর পদ গ্রহণ করেন। (Honorary)

ধর্ম্মজীবন—তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ৺গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 'গৌরগুণ হিতৈষিণী' সমিতি গঠিত হয়; উদ্দেশ্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার। এই সভায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করতে গিযা 'মহাপ্র— স্বতন্ত্র মন্ত্র নাই—এই মন্তব্যের প্রতিবাদে শ্রীখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়গণের উদ্যোগে ১৩২০ খৃঃ মাঘ মাসে নবদ্বীপে অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে যোগদান করেন—বৃন্দাবন হতে শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, শ্রীল দামোদর গোস্বামী এবং মানকর হতে সৃষ্টিধর গোস্বামী। মণীন্দ্রবাবুও ঐ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন .এবং এই প্রসঙ্গে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রীখণ্ডের গোস্বামীদের জয় হয়।

১৯৩৪ সালে তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন; ক্রমশঃই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়।. ১৯৩৯ সালে মার্চ্চ মাসে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীজহরলাল নেহরুর পত্র—১২।১।১৯২৪

মহাত্মার আশীর্ব্বাদ পত্র—৬।৭।১৯২৪

সুভাষ চন্দ্রের পত্র ৯।৮।৩৭

B. P. C. E. এর সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পত্র—২৭ ৪।২৫

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র—২৪।১২।২৫

[illegible]।৩৭

—